যুগের যাত্রী

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সেন ব্রাদার্স্ এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ—১৩৫৩

মূল্য—২॥০

সেন ব্রাদার্সের পক্ষ হইতে বলাই সেন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১২নং গৌর মোহন মুখার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা, উমাশঙ্কর প্রেস হইতে
শ্রীমৃগেন্দ্রনাথ কুমার কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সমর্পণ

যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া

এই গ্রন্থের

নারায়ণী চরিত্রটি

অঙ্কিত করিবার সুযোগ পাইয়াছি

ডিক্রিতে যিনি অপ্রমত্তা—ডিসমিসেও অবিচলিতা

সুখ ও দুঃখকে একই অঞ্চলে বাঁধিয়া

সহাস্যে যিনি যাত্রাপথে চলিতে অভ্যস্তা

সেই মনস্বিনী মহিলাটির

করকমলে

শ্রদ্ধা সহকারে

এই গ্রন্থখানি সমর্পিত হইল
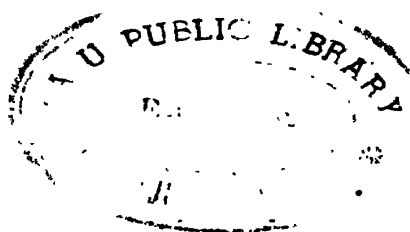
পরিচয়

নূতন পথে কতিপয় মনস্বিনী নারীর পদক্ষেপ নবযুগের জয়যাত্রায় পরিণত হইয়া যে অভিযাত্রী-গোষ্ঠী গঠন করিয়াছে—তাঁহাদের শ্রেণী, রুচি ও প্রকৃতিগত একত্ব এবং নারীত্ব প্রত্যেককেই এক জাত ও একই ধর্ম্মীরূপে চিহ্নিত করায় সেই দুর্বার গতি ভঙ্গিকে যুগের যাত্রী নামে অভিহিত করা হইয়াছে। বাঙ্গলার নারীসমাজের যাত্রাপথে গ্রন্থখানি আলোকপাত করিলেই লেখকের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

দোল-পূর্ণিমা
ফাল্গুন, ১৩৫৩
৪২, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
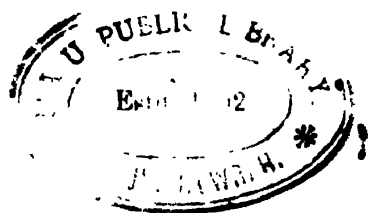
এক

চমৎকৃত হইবারই কথা বটে !

অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়া জনপ্রিয় অধ্যাপক অজয়কুমার ভট্টাচার্য শহরের এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ীর কুখ্যাত পণ্য-প্রতিষ্ঠানে অর্থের আকর্ষণে চাকুরী লইবেন—কেহ কি একথা কোন দিন কল্পনাও করিতে পারিয়াছিল ?

একটি লোকের কর্মত্যাগে কত লোকের মর্মদ্বারে ঝন্‌ঝনা বাজে—একটি মানুষের মনোবৃত্তির বিবর্তনে কত সুস্থ মস্তিষ্কে শিহরণ উঠে !

সহকর্মীরা শ্লেষের সুরে বলেন : ক্লাসে কমার্সের লেকচার দিতে দিতে অজয় ভায়া নিশ্চয়ই ভাবতেন—চাল চিনি কয়লা কেরোসিন ইত্যাদি জীবনযাত্রার অনুষঙ্গগুলিকে কেমন করে নিজের প্রয়োজনে সুলভ করা যেতে পারে, তাই কমারসিয়াল ঘাঁটিটা ক্যাপচার করে হাতে-কলমে কমার্স দেখিয়ে দিলেন।

কলেজের কমন-রুম ছাত্রদের মন্তব্যে মুখর হইয়া উঠে—মজুতের কারবার আর মজুতদারদের অনাচার নিয়ে ক্লাসে স্যার কি লেকচারই ঝাড়তেন, অথচ কলেজ ছেড়ে ওদের আফিসেই সেঁধুলেন চাকরী নিয়ে ! খাসা একজম্পল্‌ !

প্রতিবেশীদের মধ্যেও কত রকম আলোচনা হয়। কেহ বলেন : বেঁচে থাকাটাই যেখানে বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে, সে-ক্ষেত্রে বাঁচবার রাস্তাটা খুঁজে নিয়ে ও ছোকরা ত বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছে।

কলেজ থেকে কত আর কামাত বলো—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলাতো না, আমরা ত সব জানি। এর পর দেখো—বছর ঘুরতে না ঘুরতে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠবে।

কথাটার উপর রসান দিয়া অপরে মন্তব্য করেন—পরে কেন, এখনি ত দেখছি। চাল চিনি কয়লার জন্যে কনট্রোলের দোকানে দোকানে ধর্ণা দিয়ে আমাদের কি হায়রানি। চাল কিছু পাই ত; চিনি মেলে না, আবার চিনির সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কয়লা যায় ফুরিয়ে। আর—ওদিকে অজয়দের বাড়ীর দরজায় এসে লাগে হাজি সায়েবের গাড়ী—ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে বস্তা-ভরা চাল, চিনি, কেরোসিনের টিন! এই নিয়ে অজয়ের বাবার জ্যামাক যদি দেখতে—রেখে-ঢেকে কথা কয় না হে, জাঁক করে সবার সামনে বলে কি না—অজয়ের এখন পাথরে পাঁচ কীল, মিনিষ্টাররা পর্য্যন্ত ওর মতলব না নিয়ে কিছু করে না—কমার্স পড়া ওর সার্থক হয়েছে এত দিনে। চালের মণ চল্লিশেই উঠুক, আর চিনি যেখানেই চাপা থাকুক, অজয়ের 'দৌলতে' সুড়-সুড় করে বাড়ীতে এসে হাজির হবেই। কয়লা কেরোসিন যে চুলোতেই লুকুক আমাদের বাড়ীতে চুলো জ্বলবেই।

কথাগুলি শ্রবণবিবরে প্রবেশ করিয়া শ্রোতাদের চোখগুলিও বুঝি কপালের দিকে ঠেলিয়া তুলিয়া দেয়; আর, সে-দৃষ্টির প্রখর আলোকে ভট্চায-বাড়ীর পরিপূর্ণ ভাঁড়ারটি সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যেন। সেই সঙ্গে নিজেদের অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিয়া বিধাতার এই পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থার উদ্দেশে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াই নিরস্ত থাকে ইহারা।

প্রতিবাসীদের আলোচনা নানা আকারে সদয় ভট্চায এবং তাঁর পরিজনদের ও শ্রুতি স্পর্শ করিয়া থাকে! আলোচনাকারীদেরই কেহ কেহ বাড়ী বহিয়া পাড়াপড়সীদের গাত্রজ্বালার ব্যাপারটা শুনাইয়া দিয়া যায়।

গৃহস্বামী সদয় ভট্টচায তাহাতে প্রচুর কৌতুক বোধ করেন, পুত্রের উপরি পাওনার ফিরিস্তি শুনাইয়া এবং আরো অনেক বৃহত্তর সম্ভাবনার আভাষ দিয়া সংবাদদাতাকে চমৎকৃত করিয়া দেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এইখানে যে, বাড়ীর কর্তা হইতে সুরু করিয়া সাধারণ দাসীটি পর্য্যন্ত যেখানে অজয়ের এরূপ উপার্জনে উল্লাস-গর্বে ফাটিয়া পড়িবার মত হয় এবং প্রত্যেকেই বাহিরের লোকের সমক্ষে নাসিকা তুলিয়া থাকিতে চায়, বাড়ীর কনিষ্ঠা বধূ—অজয়ের সহধর্মিণী বন্দনা দেবীকেই একমাত্র সেখানে বিদ্রোহ তুলিতে দেখা গেল। অথচ বাড়ীশুদ্ধ সকলেই জানে, এই বধূটি এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি তাহার সহনশীল মধুর প্রকৃতি ও নারীসুলভ আক্কেল-বিবেচনায় বাড়ীর সকলকেই আকৃষ্ট করিয়াছে—এই সংসারটির সহিত নিজেকে মানাইয়া লইবার জন্য যেন ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বসিয়াছে।

অবশ্য বন্দনার এই সহনশীলতা ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টার মূলে তাহার শিক্ষাব্রতী পিতা অমরনাথের শিক্ষার প্রভাব কি ভাবে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা অন্যে না জানিলেও বন্দনা ভালো করিয়াই জানে যে, সাংসারিক প্রত্যেক ব্যাপারেই পিতার কথাগুলি বরাবরই তাহাকে প্রচুর প্রেরণা দিয়াছে। বিবাহের পরদিন অমরনাথ কন্যার মাথার উপর হাতখানি রাখিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলিয়াছিলেন: মনে রেখো মা, মস্ত দায়িত্ব আর কর্তব্য তোমার সামনে। নতুন পথে জীবনের যাত্রা সুরু হচ্ছে আজ। এমন জায়গায় চলেছ, যাদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন-সংস্কার—সবই হয়ত তোমার পক্ষে আলাদা ঠেকবে, মত নিয়েও গরমিল হওয়া আশ্চর্য নয়! কিন্তু মা, মাথা ঠিক রেখে নিজের বুদ্ধি খেলিয়ে,

আর যে-শিক্ষা আমার কাছে এত দিন পেয়েছ, তারই আলোয় তোমাকে সব কর্তব্য বেছে নিতে হবে। এইখানেই বধূ-জীবনের পরম ও চরম সার্থকতা মা।

বাবার কথাগুলি যে কত সত্য, শ্বশুরবাড়ীতে আসিয়াই বন্দনা তাহা হাড়ে হাড়ে বুঝিতে পারে। শাশুড়ী সারদা দেবীর সেরেস্তায় প্রথমেই তাহাকে যে কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হয়, যে কোন নববধূর মুখখানা তাহাতে চুণ হইবার কথা। বধূর প্রকোষ্ঠের অলংকারগুলি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া সারদা দেবী রুক্ষ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন: হ্যাঁ বৌমা, ওঁদের মুখে শুনেছিলাম, পাকা-দেখার দিন তোমার হাতে না কি দু'গাছা করে বরফি-কাটা চুড়ি দেখেছিলেন। সেগুলো ত তোমার হাতে দেখছি নে, তোরঙ্গয় আছে, না তোমার মা দিতে ভুলে গেছেন?

বিবাহ-বাসরেই বরপক্ষ ফর্দের সহিত মিলাইয়া গহনাগুলি বুঝিয়া লইয়াছিলেন, ওজনে বরং সোনা কিছু বেশীই হইয়াছিল। এখন যে গহনা লইয়া এ প্রশ্ন উঠিবে, তাহা বন্দনার কল্পনারও অতীত। কিন্তু পিতার কথা ও শিক্ষা মনে করিয়া সে নিজেকে সামলাইয়া লইল, কোন প্রতিবাদ না করিয়া কিংবা চুপ করিয়া না থাকিয়া দিব্য সপ্রতিভ কণ্ঠে শাশুড়ির গায়ে পড়ার মত হইয়া বলিল: মা আমাকে সে গয়না দিয়েছিলেন মা, কিন্তু সেগুলো খ'য়ে গেছে আর আমার ছোট বোনের হাতে কিছু নেই ব'লে তার হাতেই পরিয়ে দিয়ে এসেছি—ভাল করিনি মা?

এমন সরল ভঙ্গিতে আর মিষ্টি সুরে বন্দনা কথাগুলি বলিল যে, যাহারা সেখানে ছিল, প্রত্যেকেই মুগ্ধ হইয়া গেলেন। আর শাশুড়ীকেও দশ-জনের সামনে নিজের মুখ রাখিতে গম্ভীর মুখে অগত্যা বলিতে হইল: তা বেশ করেছ!

এই ভাবে পদে পদেই একটা না একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতি দেখা দিয়াছে, আর বন্দনাকে মাথা খেলাইয়া উপস্থিত-বুদ্ধি খাটাইয়া সেগুলির উপসংহার করিতে হইয়াছে। সে জানিতে পারিয়াছিল যে, এ-বাড়ীর কর্তা ও গৃহিণী থেকে কোলের ছেলে মেয়েগুলি পর্যন্ত প্রত্যেকেই যেন এক একটি জীবন্ত যন্ত্র—একটা বাঁধা-ধরা প্রাচীন সংস্কার তাহাদিগকে চালাইতেছে। নূতন যুগ বা নব জীবনের বাণী এ বাড়ীতে বুঝি প্রবেশ করিবার পথটিও এখন পর্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। কলিকাতার মত মহানগরীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির সহিত দীর্ঘকাল যাবৎ সংশ্লিষ্ট এই মধ্যবিত্ত ভদ্র পরিবারটির পক্ষে মধ্যযুগের মনোবৃত্তি কেমন করিয়া যে এখনও চালু রহিয়াছে—সমগ্র কুমারী-জীবন বাংলা দেশের বাহিরে কাটাইয়াও বন্দনা তাহা ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে নাই।

প্রথম দিনেই শাশুড়ীর প্রশ্নটি তাহার অন্তরে যে পরিমাণে আঘাতের বেদনা দেয়, তার শত গুণ বেদনাদায়ক হইয়া বাজে বড় জা হেমপ্রভার নিষ্ঠুর মন্তব্যটি—বৌএর কি লাগানি স্বভাব মা?

বন্দনাকে লক্ষ্য করিয়া এবং যাহাতে কথাগুলি তাহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, এমন করিয়াই হেমপ্রভা হাত-মুখ ঘুরাইয়া মেজ ও সেজ জাকে শুনাইতেছিল।

শুনিবামাত্র বন্দনাকে স্তব্ধ হইতে হয়। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলাইয়া এবং মুখখানা শক্ত করিয়াই সে তিন জায়ের কাছে আগাইয়া আসে। তাহার পর কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই দিব্য সহজ কণ্ঠে বলে: লুকিয়ে কারুর কথা শুনে, তাই নিয়ে চর্চা করতে নেই দিদি! জানি, মানুষের স্বভাব সহজে বদলায় না; কিন্তু সেটা বদলাবার সহজ উপায় হচ্ছে দিদি, নিজের অবস্থাটা বুঝে দেখা। আপনারা তিন জনেই আমারই মতন নতুন বৌ হয়ে এ বাড়ীতে যখন এসেছিলেন, নিশ্চয়ই মুখ বুজিয়ে থাকেননি! সেদিনের কথাগুলো মনে করুন ত!

নতুন বৌ এর মুখ থেকে মুখের মতন জবাব পাইয়া তিন বৌয়ের মুখ [illegible]সঙ্গেই অন্ধকার হইয়া যায় এবং ইহার পরে বলিবার মত আর কোন কথাই তাহারা [illegible]জিয়া পায় নাই।

পত্নীর প্রগতিশীল অন্তরটির মোটামুটি পরিচয় পাইয়া অজয় তাহাকে যখন জিজ্ঞাসা করে: এখানকার হালচাল তোমার বোধ হয় ভালো লাগছে না? বন্দনা তখন প্রসন্ন মনেই উত্তর দেয়: না লাগলেও মানিয়ে নিতে হবে ত? পরকে আপন করতে হলে স্বার্থত্যাগ ত করতেই হবে।

সুতরাং এ বাড়ীর এই সব প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পড়িয়াও বন্দনাকে সে-যুগের মহীয়সী নারীদের মত প্রচুর স্বার্থত্যাগ ও অসাধারণ সহনশীলতার প্রভাবে বধূর মর্যাদাটুকু পদে পদে রক্ষা করিতে হইয়াছে এবং তিনটি বৎসর পরে এ সংসারে তাহার আসনটি যেই পাকা-পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক সেই সময় শিক্ষাব্রতী স্বামীর বৃত্তিত্যাগে আর এক শোচনীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এত দিন যে ধৈর্য ও উৎসাহকে সম্বল করিয়া বন্দনা সাংসারিক প্রতিকূল অবস্থাগুলির সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াইয়া লইয়াছিল, এ ক্ষেত্রে তাহার সে অসীম ধৈর্য ও বুদ্ধিদীপ্ত চিত্তের বিপুল উদ্যম-উৎসাহ একেবারেই শিথিল হইয়া পড়ে। সর্বাধিক মর্মান্তিক হইয়া দাঁড়ায় স্বামী অজয়ের কাপুরুষোচিত ব্যবহার। নূতন বৃত্তিটি-যে বন্দনার একান্ত অনভিপ্রেত এবং যুক্তিতর্কেও তাহাকে মতানুবর্তী করা সম্ভবপর নয়, ইহা জানিয়াই সে পত্নীর অগোচরে চুপি-চুপি হাজি সহেবের কুখ্যাত প্রতিষ্ঠানটির সহিত চুক্তিবদ্ধ হইয়াছিল। কাজটি এমনই সংগোপনে ও সন্তর্পণে পাকা হইয়া যায় যে, বাড়ীতে ঘটা করিয়া তদুপলক্ষে সত্যনারায়ণের শিণীর ব্যবস্থার আগে ঘুণাক্ষরেও কিছুই জানিতে পারে নাই বন্দনা। উৎসব-রজনীতে কথাটা যখন জানাজানি হইয়া যায়, অজয়ের উজ্জ্বল

ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বহুকণ্ঠের প্রশস্তি ফেনাইয়া ওঠে শুনিতে শুনিতে বন্দনার মনে হয়, স্বামীর কর্ম-জীবনের নির্মল আকাশটির উপর সহসা কাল-বৈশাখীর যে কালো মেঘ ঘনাইয়া আসিয়াছে—তাদের মধুর দাম্পত্য-জীবনটীও ক্রমশঃ তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িবে। শিক্ষাব্রতী স্বামীর শিক্ষিত ভদ্র মন যে এভাবে অর্থের মোহে আদর্শভ্রষ্ট হইবে ইহা তাহার কল্পনারও অতীত! ব্যাপারটা আরো বেদনাদায়ক হইয়া দাঁড়ায় আত্ম-গোপনের জন্য স্বামীকে এই ভাবে অপকৌশলের আশ্রয় লইতে দেখিয়া। অজয়ের ভাগ্যোদয়ের খবরটির সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বাড়ীতে জানাজানি হইয়া গিয়াছে যে, কার্যভার গ্রহণ করিয়াই তাহাকে মফস্বলে যাইতে হইয়াছে শাখা-প্রতিষ্ঠানগুলির তত্ত্বাবধানে; আশু ফিরিবার সম্ভাবনা যদিও নাই, কিন্তু লাভের না কি সুপ্রচুর সম্ভাবনা সুতরাং এ-বাড়ীতে এই সূত্রে হর্ষোল্লাস স্বাভাবিক। বন্দনা বুঝিয়াছে, তাহার সম্মুখে আসিয়া মুখ তুলিয়া দাঁড়াইবার মত সাহস অজয়ের নাই। কিন্তু একদা অগ্নিসাক্ষ্য করিয়া যাহারা মধুর দাম্পত্য-জীবনে গ্রন্থি-বন্ধন করিয়াছে, সেই শুভরাত্রির স্মরণীয় বাণীগুলি রাত্রির পর রাত্রি ধরিয়া উভয়ে নিষ্ঠার সহিত আবৃত্তি করিয়াছে সমস্বরে—

যদেতদ্ হৃদয়ং তব
তদস্তু হৃদয়ং মম।
যদিদং হৃদয়ং মম
তদস্তু হৃদয়ং তব।

এবং আবৃত্তির পরেই উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়াছে—আমাদের জীবনে কোন দিনই এর ব্যতিক্রম হবে না।—সেই প্রতিশ্রুতিকে আজ কি নির্মম ভাবেই হত্যা করিতে বসিয়াছে তাহাদেরই এক জন? মনকে এত ছোট করিয়া এবং প্রবৃত্তিকে এমনি বিশ্রী আবর্জনাপূর্ণ নর্দমার নীচে নামাইয়া দিয়াছে

যে, সেখান থেকে জীবনসঙ্গিনীর দৃষ্টির সঙ্গে দৃষ্টি মিলাইবার সাহসটুকুও তাহার নাই!

বাড়ীতে যখন এক জনের সৌভাগ্যের জন্য আনন্দের হুলাহুলি চলিয়াছে, বাড়ীর এক জন—তথাকথিত সৌভাগ্যের বরপুত্রটির সর্বাধিক প্রিয়জন—প্রবল স্বার্থপরতার চাপে নিষ্পিষ্ট অবরুদ্ধ উপায়হীনতার প্রতিচ্ছবিটির মত একান্তে বসিয়া ভাবিতে থাকে—বাঙালীর জাতীয় জীবন নতুন করে গড়ে তোলবার স্বপ্ন যারা দেখে এসেছে বরাবর, আজ তাদের জীবনে এল এ কি দুর্যোগ! এ কি নিয়তির নিষ্ঠুর আঘাত—যাবজ্জীবনের জন্য দণ্ডাদেশ, কিংবা অদৃষ্টের সাময়িক পরিহাস!

বধূর ভাবান্তর বাড়ীর সকলের অন্তর স্পর্শ করে। গৃহস্বামী সদয় ভট্টাচার্য মহাশয় গৃহিণীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করেন: ছোট বৌমাকে অমন বিমর্ষ দেখি কেন? মুখে সে হাসি নেই, উৎসাহ যেন নিবে গেছে, শরীর ভালো আছে ত, না—আর কিছু?

চারি দিকে সন্দিগ্ধ ও সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চারিত করিয়া গৃহিণী মুখখানি গম্ভীর করিয়া বলেন: হবে আবার কি, সে সব কিছু নয়। তবে মুখ যে গোমড়া করে আছে—তার কারণ হচ্ছে অজুর নতুন চাকরী ওঁর না কি ভাগে লাগেনি।

বল কি! কলেজে যে মাইনে পেত, তার চার গুণ বেশী পাচ্ছে এখানে, তা ছাড়া—

ঐ চালের বস্তা আসার কথা বলছ ত? সেই ত হয়েছে কাল! ঐ সব জিনিষ উপরি আসা থেকেই ত বৌমার মনের হদিস পেয়েছি না!

কি ব্যাপার শুনি?

শুনলে রাগে তোমার পিত্তি জ্বলে উঠবে। হাজি সাহেবের গাড়ী এসে চালের বস্তা, থলে-ভরা চিনি আর কেরোসিনের টিন নামিয়ে দিতে পাড়ায় যখন হৈ-চৈ পড়ে যায়, বৌমা তখন ঘরে খিল এঁটে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ে কেঁদেই খুন!

এমন? কিন্তু কান্নাকাটির কারণ?

কারণ ঐ অজুর উপরি পাওনা—না চাইতেই অত জিনিষ বাড়ী ব'য়ে এসে পড়লো, তাই। ওঁর না কি এ সব বরদাস্ত হচ্ছে না; জাঁক করে বলা হয়েছে—এক সের চালের জন্যে লোকে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে, এক মুঠো ভাতের তরে কত লোক শুকিয়ে মরছে, আর কি না আমাদের বাড়ীতে সেই চাল কত লোকের আশায় ছাই দিয়ে না-চাইতেই আসছে; এর আষ্টে-পৃষ্ঠে না কি শাপ-মন্যি মাখানো আছে!

কারণটি গৃহিণী ঠিক বুঝাইয়া বলিতে না পারিলেও বিচক্ষণ গৃহস্বামী কথাটা পড়িবামাত্রই বুঝিয়াছিলেন। নিয়মিতরূপেই তিনি বাংলা সংবাদপত্র পড়িয়া থাকেন; সুতরাং সহরের মজুতদার ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে নিত্যই যে সব অভিযোগ ছাপা হইয়া থাকে, পড়িয়া পড়িয়া সেগুলি তাঁহার-কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছে। এখন মনের মধ্যে বেদনার উদ্রেক হয় না, বরং রীতিমত কৌতুকবোধ করিয়া বলিয়া থাকেন: অজুর কল্যাণে আমরা যদি র্যাসনের ঢালাও সুবিধা না পেতাম. খবরের কাগজে এমনি করে নালিশ আর শাপমন্যি ছাপিয়ে বেড়াতে হোত।

আলোচ্য কথাটার প্রসঙ্গে গৃহিণীকে বলিলেন: তা, বৌমার যখন এখানকার সুখ বরদাস্ত হচ্ছে না, দিন কতক না-হয় ও'র বাপের বাড়ীতে থেকে সুখটাকে রপ্ত করে আসুন। ওর বাবা হচ্ছেন ইস্কুল-মাষ্টার, ছেলে চরিয়ে সংসার চালান; এ-বাজারে কত সুখে সংসার চালাচ্ছেন

তিনি, বৌমার সেটা জেনে আসা উচিত। আজই আমি চিটি লিখছি তাঁকে -- যেন শীগ্‌গির এসে মেয়েকে নিয়ে যান।

শিক্ষাব্রতীরূপে দীর্ঘকাল বাংলার বাহিরে কাটাইয়া বন্দনার বিবাহসূত্রে বছর চারেক পূর্ব্বে অমরনাথ সেই যে পৈতৃক আবাসভূমিতে আসিয়াছিলেন, বিবাহের পরে মাতৃভূমির মাধুর্যের মোহ কাটাইয়া কর্মস্থানে ফিরিয়া যাওয়া তাঁহার পক্ষে আর সম্ভব হয় নাই। শহর-সংলগ্ন বেলিয়াঘাটা অঞ্চলটি তখন সংস্কৃত ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে ; মহানগরীর কর্ম-চাঞ্চল্যের স্রোত এই প্রত্যন্ত অংশ পর্যন্ত গড়াইয়া জনাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে ;—বিভিন্ন শিক্ষালয়, শিল্পশালা, বড় বড় বিপণি, পাঠাগার, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক, বীমা, কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রভৃতি বিবিধ সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান—অমরনাথের আবাল্য-পরিচিত পল্লী-শ্রী-মণ্ডিত অঞ্চলটির প্রশান্ত পটভূমিকার উপর চক্ষু-চমৎকারী কত প্রখর চিত্রই আঁকিয়া দিয়াছে! পূর্ব-পরিচিত প্রতিবেশীরা অমরনাথকে পাইয়া যেন বর্তাইয়া গেলেন। দেশের বাইরে কর্মজীবনের বিকাশ হইলেও অমরনাথের বিদ্যা এবং শিক্ষার ব্যাপারে প্রগাঢ় নিষ্ঠার কথা সুধীসমাজের অজ্ঞাত ছিল না। স্থানীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ সসম্মানে তাঁহাকে পদোচিত মর্যাদা দিয়া বাধ্য-বাধকতার বন্ধনে আটকাইয়া ফেলিলেন। দক্ষিণা অল্প হইলেও দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত এই প্রবীণ শিক্ষাব্রতী স্থানীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের আহ্বান ও স্বেচ্ছাপ্রাণোদিত ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। পৈতৃক বাড়ীখানিকে সংস্কৃত করিয়া অমরনাথকে নূতন করিয়া সংসার পাতিতে হয় ; মাতৃভূমির সহিত পুনরায় যোগসূত্র রচনায় আনন্দ তাঁহার পরিজনবর্গকে অভিভূত ও উৎসাহে উদ্দীপিত করে। বৎসর

খানেকের মধ্যেই বন্দনার বিবাহ হইয়া যায়। পণ-সম্পর্কে বরপক্ষের অনুদার মনোবৃত্তি অমরনাথের অন্তরে কাঁটার মত বিঁধিয়া বেদনা দিলেও বরের কর্মজীবনের প্রশংসনীয় বৃত্তির পরিচিতি সে বেদনায় পরিতৃপ্তির প্রলেপ দিয়া তাঁহাকে উৎফুল্ল করে। উচ্চশিক্ষিত এবং শহরের কোন বিশিষ্ট কলেজের শিক্ষা-ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট স্বামীর সাহচর্য পাইয়া তাঁহার কন্যা যে বধূজীবনকে সার্থক করিয়া তুলিবে, এ সম্বন্ধে তিনি প্রচুর আশা পোষণ করিতেন। তাই বন্দনা যখন শ্বশুরালয় হইতে তাঁহাকে লিখিয়া জানায়:

এখানে এসে এঁদের মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে আমি বিজয়িনীর গৌরব লাভ করেছি, বাবা! পদে পদে প্রতিকূল অবস্থার ভেতরে নিজের সাফল্যে কি যে আনন্দ—সে কথা লিখে জানানো সম্ভব নয়, সাক্ষাতে সব বলবো।

সত্যই কন্যার পত্রের কয়টি ছত্র পড়িয়া পিতার অন্তরটি আনন্দের আতিশয্যে কাণায় কাণায় ছাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। সে পত্র স্ত্রী শান্তা দেবীকে শোনাইয়া প্রফুল্লমুখে বলিয়াছিলেন তিনি: সত্যই, মেয়ে আমার মুখ রেখেছে. আমার শিক্ষাকে করেছে সার্থক।

তার পর আরও তিনটি বৎসর পৃথিবীর ইতিহাসের পাতায় বহু জটিল পরিস্থিতির গভীর রেখাপাত করিয়া কাল-সমুদ্রে মিশিয়া গিয়াছে। বিপর্যস্ত হইয়াছে বাঙালীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রা, রীতিমত ভাঙন ধরিয়াছে জাতির নৈতিক জীবনে। বাংলার বুকের ওপর আস্তানা গাড়িয়া মহাযুদ্ধের বিরাট সরবরাহ-ব্যাপার চালু হওয়ায়, সেই সুযোগে বাহির হইতে এক শ্রেণীর মুনাফাখোর আসিয়া অতি-লোভের এমন এক সংক্রামক বিষ ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিয়াছে—বাংলার মাটি বা বাঙালী জাতির সঙ্গে যার কোন পরিচয়ই ছিল না। সেই বিষ বাংলাকে নিঃস্ব এবং বাঙালী

জাতির আদর্শ জীবনকে দূষিত ও বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। দেশ, জাতি ও মানবতার কলঙ্কস্বরূপ এই অতিলোভীরাই প্রতিপন্ন করিয়াছে—মাটির সম্পদ এত বড় হইয়া ইহার পূর্বে মানুষকে এত ছোট আর কোন দেশে কোন দিন করে নাই।

এই শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যে অমরনাথকে যে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে তাহা সত্যই কল্পনাতীত। বন্দনার বিবাহে সঞ্চিত সব কিছুই নিঃশেষ করিয়াই নিষ্কৃতি লাভ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটে নাই—তিনটি বৎসর ধরিয়া তত্ত্ব-তাবাসের ব্যয়বহুল ঝঞ্ঝাট কাটাইতে হইয়াছে। দিনে দিনে দ্রব্যমূল্য বর্ধিত হইতে থাকায় একে ত ব্যয়ের হার সীমা অতিক্রম করিয়াছে, তাহার উপর পাওনাদারের তাগদার চেয়েও মর্মান্তিক হইয়া উঠে কুটুমবাড়ীর চাহিদার আবদার। ফলে, সংসারের খরচ কমাইয়া ঘটা করিয়া সর্বাগ্রে তাঁহাদের মান বজায় রাখিতে হয়। এই ভাবে ব্যয় বাড়িলেও, আয় বাড়ে নাই। তাহার উপর নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যগুলি সংগ্রহ করিতে তাঁহার মত আত্মভোলা শিক্ষাব্রতীকে যে কিরূপ বিব্রত এবং কতখানি অসুবিধা সহ্য করিতে হইয়াছে, তাঁহার অন্তর-দেবতাই জানেন।

জীবনযাত্রায় যখন এইরূপ দুর্ভোগ চলিয়াছে, সেই সময় ডাকযোগে বন্দনার একখানি চিঠি আসিয়া অমরনাথের মস্তিষ্কের স্নায়ুসূত্রে নূতনতম এক আবেগময় অনুভূতির ঝঙ্কার তুলিল। বন্দনা লিখিয়াছে :

এবার আমি হেরে গেছি, বাবা! এমন প্রতিকূল অবস্থার সামনে পড়তে হয়েছে—লড়াই যেখানে চলে না। মর্মান্তিক আঘাত পাবেন জেনেও, না জানিয়ে পারছি নে—বাণীর দেউল থেকে উনি বিদায় নিয়ে কোন কুখ্যাত মজুতদারের দপ্তরে নাম লিখিয়ে আঙুল ফুলে কলাগাছ হতে গেছেন। কাজেই, চারি দিকে অক্ষমদের কান্না শুনে বুক যখন

শুকিয়ে যায়, চোখ দুটো কপালে তুলে দেখি—যে-সব জিনিয়ের জন্যে এত হাহাকার, সে-সব এ বাড়ীতে কত সহজে আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত পরিমাণে এসে জমেছে উদ্বৃত্ত ভাত ডাল নর্দমা দিয়ে ব'য়ে যায় তবু আতুরদের দেবার উপায় নেই। এ অবস্থায় আর ত থাকা চলে না—এখানকার অন্ন মুখে তুলতে পারি নে এই ভেবে যে, নিরুপায় বহু লোককে বঞ্চিত করে যে-সব জিনিষ এখানে সঞ্চিত হয়েছে তার প্রতিটি অভিশপ্ত। তাই এখানকার সংস্পর্শ কাটিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি বাবা!

চিঠিখানি পড়া শেষ হইতেই অমরনাথের সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া কণ্ঠ দিয়া একটা স্বর সশব্দে নির্গত হইল: তুমি হেরে যাওনি মা, জিতে গেছ। দেশের এই দূষিত আবহাওয়ার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নৈতিক আদর্শকে বাঁচাবার জন্যে তোমার এই সাহসের সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে।

স্ত্রী শান্তা দেবীকে ডকিয়া বলেন: ওগো শুনেছ, বন্দনা আবার ফিরে আসছে আমাদের কাছে, দুঃখের সঙ্গে বোঝা-পড়া করবার জন্যে আর একটা শক্তি আমাদের বাড়ছে।

সমস্ত শুনিয়া শান্তা দেবী বলিলেন: ছেলে নিয়েই জামায়ের কারবার, একেবারে তোমার স্বগোত্র—এই আহ্লাদে আর কোন দিকেই তখন দৃক্‌পাত করোনি, কত ভাল ভাল ঘর-বর এসেছিল, ছেলে কেরাণী ব'লে মনে ধরেনি, এখন হোল ত! জামাই সেই চাকরীতেই ঢুকলেন!

গম্ভীর মুখে অমরনাথ বলিলেন: তার জন্যে আমার দুঃখ নাই। আমি যে আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিনি, আর বন্দনাও এদিক্ দিয়ে আমার মুখ রেখেছে, এতেই আমার শান্তি।

পরদিন অমরনাথ বৈবাহিক সদয় ভট্টাচার্যের একখানি পত্র পাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন:

শুনেছেন বোধ হয়—অজয় কলেজের প্রফেসারী ছেড়ে দিয়ে একটা

চাকরী নিয়েছে। চাকরীটা সাধারণ হলেও, উপায়টা অসাধারণ, কিন্তু আপনার কন্যা তাতে খুসি নন। তিনি চান—ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে যায়, অর্থাৎ আপনার মতন ছেলে চরিয়েই অজয় জীবনটা কাটিয়ে দেয়। তাঁকে নিয়ে আমার শান্তির সংসারে অশান্তির ঝড় বয়ে চলেছে। এখানকার আবহাওয়া তাঁর সহ্য হচ্ছে না। তাই আমার ইচ্ছে—কিছু দিন ওখানে গিয়ে হাওয়া বদলে আসেন। মধ্যে আপনি নিজেই বৌমাকে নিয়ে যাবার জন্যে অনেক সাধ্য-সাধনা করেছিলেন—আমি তখন রাজি হ'তে পারিনি,- আর আজ নিজেই উপযাচক হয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে লিখছি। এতেই ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝে তাড়াতাড়ি আসবেন।

সেই দিনই অপরাহ্নে অমরনাথ বৈবাহিক-ভবনে উপস্থিত হইলেন। কলিকাতার উত্তরাঞ্চলে জনবহুল এক পল্লীতে ইঁহাদের আবাস-ভবন। বাহিরের ঘরখানি ভরিয়া তখন সদয় ভট্টাচার্যের আসর বসিয়াছে। সকালে বিকালে তাঁহার বৈঠকখানা-ঘরে এখন আর লোক ধরে না। অমরনাথকে দেখিয়া ভট্টাচার্য মহাশয় ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন: আসতে আজ্ঞা হোক বেই মশাই—কিন্তু এ কি, চেহারা এমন খারাপ দেখছি যে!

মৃদু হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন: চেহারার দোষ কি বলুন, দেশের লোক যেখানে খেতে পাচ্ছে না, কি করে চেহারা ভাল থাকতে পারে?

কথাটা ভট্টাচার্য মহাশয়ের ভাল লাগিল না, প্রচ্ছন্ন শ্লেষের সুরে জিজ্ঞাসা করিলেন: দেশের লোক খেতে পাচ্ছে না বলে আপনার চেহারা খারাপ হবে কেন? আপনার খাওয়ায় ত তারা ব্যাঘাত ঘটায়নি।

গাঢ় স্বরে অমরনাথ বৈবাহিকের কথার উত্তর দিলেন: আমি কি দেশের লোক ছাড়া বেই মশাই? তাদের খাওয়ায় ব্যাঘাত ঘটলে আমার সম্বন্ধে ত ব্যতিক্রম হতে পারে না।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গম্ভীর মূর্তি দৃঢ়বাক্ অদ্ভুত মানুষটির মুখের পানে চাহিয়া সদয় ভট্টাচার্য ধীরে ধীরে বলিলেন: কথা আর বাড়াবো না, আপনার মতন ভাব-রাজ্যের মানুষের সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ মানুষের ভাব হতে পারে না। আগে জানা থাকলে এ ভুলের বোঝা এমন করে বইতে হোত না।

শান্ত স্বরে অমরনাথ বলিলেন: আপনার সে বোঝা আমি হাল্কা করতেই এসেছি।

সোজা হইয়া বসিয়া সদয় ভট্টাচার্য জিজ্ঞাসা করিলেন: আপনার মেয়েকে তাহলে এখনি নিয়ে যেতে চান?

মুখখানি প্রসন্ন করিয়া অমরনাথ বলিলেন: আজ্ঞে হ্যাঁ, আমি প্রস্তুত হ'য়েই এসেছি।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া সদয় ভট্টাচার্য বলিলেন: আচ্ছা, আপনি বসুন। আমি এখনি তাঁকে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি। কিন্তু একটা কথা বলে রাখছি এই সঙ্গে—বৌমার মাথা থেকে আপনার ঐ স্কুল-মাষ্টারী ভাবটা যাতে সরে যায়, এখন থেকে সেই চেষ্টাই করবেন। অবশ্য, যদি তাঁর এ-ঘর করবার ইচ্ছা থাকে।

পূর্ব্ববৎ প্রসন্ন মনেই অমরনাথ উত্তর দিলেন: যে আদর্শ নিয়ে আমার কন্যা এ-বাড়ীতে এসেছিল, সেই আদর্শ সঙ্গে করেই সে ফিরে চলেছে। এ-আদর্শকে কোন দিনই সে ত্যাগ করতে পারবে না—এখানকার ঘরের মোহেও নয়।

জ্বলন্ত দৃষ্টিতে অমরনাথকে বিদ্ধ করিয়া সদয় ভট্টাচার্য নীরবে বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেলেন।

খানিক পরে বাড়ীর পরিচারিকা বৈঠকখানার দরজার কাছে দাঁড়াইয়া জানাইল: বাবু, বৌদিদি এসেছেন। আপনি কি গাড়ী এনেছেন?

অমরনাথ ব্যস্ত ভাবে বাহিরে আসিতেই বন্দনা হেঁট হইয়া গড় করিল, তার পর মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল : বাড়ীর সব ভালো ত বাবা ?

ঘাড় নাড়িয়া ইঙ্গিতে কথাটার উত্তর দিয়া অমরনাথ বলিলেন : গাড়ী তাহলে নিয়ে আসি মা ?

মুখখানা শক্ত করিয়া আপত্তির স্বরে বন্দনা জানাইল : গাড়ীর কোন দরকার নেই বাবা, বাসেই যাবো। বাড়ীর জানলায় দাঁড়িয়ে যখন দেখি—আমার মতন কত মেয়েই চলেছে চাল-কাপড়ের জন্যে কন্‌ট্রোলের দোকানে লাইন দিতে, তখন নিজেদের আব্রুর কথা ভাবতেও লজ্জা হয়। তা ছাড়া, এঁরা হিসেব করেই ঝঞ্ঝাট কমিয়ে দিয়েছেন—পরণের কাপড় ছাড়া সঙ্গে এমন কিছু নেই, যার জন্যে গাড়ীর দরকার হবে।

চমকিত হইয়া অমরনাথ কন্যার অঙ্গে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সত্যই ত, লাল কস্তা পাড়ের একখানি শাড়ী, সাদা ব্লাউস, আর হাতে দু'গাছি রুলি ছাড়া বেশভূষার আর কোন বালাই নাই! পিছনে পরিচারিকাটি দাঁড়াইয়া আঁচলে চোখ মুছিতেছে ; মেয়েদের একান্ত অপরিহার্য তোরঙ্গটিও ইহারা দেয় নাই।

মৃদু হাসিয়া অমরনাথ বলিলেন : ঠিক বলেছ মা, হিসেব করেই এঁরা আমাদের ঝঞ্ঝাট আর বাড়াননি ; দু'জনেরই দাঁড়া হাত-পা, বাড়ী পৌঁছতে কোন অসুবিধাই হবে না।

ইহার পর আরো দুইটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে, এবং ইতিমধ্যে বহু নূতনতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে রাষ্ট্র সমাজ বাণিজ্য এবং গার্হস্থ ব্যাপারগুলিকে উপলক্ষ করিয়া।

চক্রশক্তির অক্ষক্রীড়ায় শোচনীয় পরাজয়ে মিত্রশক্তির বিপুল প্রতিষ্ঠা

বিশ্ব ব্যাপিয়া তুলিয়াছে বিস্ময়ের শিহরণ। নৃশংস যুদ্ধকে উপলক্ষ করিয়া যাহারা উপার্জনের রজ্জুতে গ্রন্থির পর গ্রন্থি দিয়া চিরস্থায়ী সংস্থানের স্বপ্ন দেখিতেছিল, যুদ্ধের এই আকস্মিক সমাপ্তিতে তাহাদের ক্ষোভের অন্ত নাই। মাত্র দুই বৎসরের ব্যাপারেই অজয়ের অদৃষ্টের পরিবর্তন হইয়াছে অপ্রত্যাশিতভাবে। পুরাতন জীর্ণ বাসবাটী এখন বিস্তীর্ণ প্রাসাদের মত চমকপ্রদ হইয়াছে। গ্যারেজে মটর, গেটে উর্দীপরা দরোয়ান। আশে-পাশের তিনখানি বাড়ী কিনিয়া মাতব্বর বাড়ীওয়ালার খ্যাতি পাইয়াছে; আরও কতিপয় বাড়ী বন্ধক রাখিয়াছে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্কে যে অর্থ সঞ্চিত হইয়াছে পরিমাণে তাহাও পর্যাপ্ত। যুদ্ধের পরিসমাপ্তি অজয়কেও রীতমত বিচলিত করিয়াছিল। কিন্তু তাহার মুরুব্বী হাজি সাহেবের সৌজন্যে ও সহযোগিতায় সে দুশ্চিন্তার অবসান হইয়াছে। সরকার-প্রবর্তিত র‍্যাসন-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়া উপার্জনের এক নূতনতম অধ্যায় তাহার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে। অর্থের বলে স্বনামে ও বেনামে শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেকগুলি র‍্যাশনের বিপণি পরিচালনার মঞ্জুরী পাওয়ায় যুদ্ধের পরেও তাহার আর্থিক ভাগ্যে ভাঁটা পড়ে নাই—জোয়ারের টান বজায় আছে।

শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্ক কাটাইয়া পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্তনের পরেই বন্দনা অজয়ের একখানি মাত্র পত্র পাইয়াছিল। সে পত্রে অজয় লিখিয়াছিল:

"বাবার পত্রে জানলাম যে, আমার উন্নতি সকলকে খুসি করলেও তুমি সুখী হতে পারোনি, বরং তোমার পক্ষে এটা হয়েছে যেন চক্ষুশূল। আমি তোমার ভুলটুকু দেখাতে চাই। দেশে লড়াই এলেই আসে বিপর্যয়; এক দল মরে, এক দল আধমরা হয়ে থাকে, আর এক দল বেঁচে থাকে—এরাই করে জীবনটাকে পরিপূর্ণ ভাবে উপভোগ। আমি এই বাঁচার দলে নাম লিখিয়ে কি অন্যায় করেছি বলতে চাও? আমি বাঁচতে চাই, এবং

বাঁচবো, সংসারে সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াবো। যদি এ সত্য স্বীকার করো, আমাকে জানালেই আমি নিজে গিয়ে তোমাকে নিয়ে আসবো। আর যদি দ্বিধা থাকে, তাও জানাতে দ্বিধা করবে না—আমিও তখন আমার কর্তব্য স্থির করবো।"

বন্দনা চিঠিখানা পড়িয়াই তৎক্ষণাৎ কর্তব্য স্থির করিয়া ফেলে এবং অজয়কে দৃঢ়তার সঙ্গে জানায়:

"বাবার পত্রে তুমি যা জেনেছো আমি তার প্রতিবাদ করবো না। কিন্তু তুমি যে যুক্তি দেখিয়ে আমার আদর্শকে ভ্রান্ত করতে চেয়েছ, আমার অন্তরকে সেটা স্পর্শ করতে পারছে না—এতই তা বিশ্রী আর নোংরা। পৃথিবী জুড়ে অনেক অপকর্মই ত চলেছে, কিন্তু সেটা আদর্শ নয়। আমার মনে হয়, প্রত্যেক ব্যাপারের নির্দিষ্ট সীমার বাইরে যাওয়াটাই হচ্ছে অন্যায় এবং অপরাধ। তুমি যাকে বাঁচবার আর জীবনটাকে উপভোগ করবার উপায় বলে মনে করছ, তার সম্বন্ধে আমার কি মনে হয় জানো? সেটা দেউলে হবার একটা ভুল পথ ছাড়া আর কিছু নয়। আমাদের দাম্পত্য জীবনের আদর্শ তুমি ভুলে গেলেও আমি তাকে ত্যাগ করতে পারিনি; তোমার যুক্তিকে আমি স্বীকার করতে না পারলেও আমার কর্তব্য হবে কুলবধূরূপে তোমাদের কল্যাণ কামনা করা। ভুলের পথে পা বাড়িয়ে তুমি দেউলে হতে চলেছ জেনে তোমার মুক্তির জন্যে কৃচ্ছ্র-সাধনাই হবে আমার জীবনের তপস্যা। সত্য যুগে রত্নাকরের স্ত্রী স্বামীর পাপের অংশ নিতে চাননি, কিন্তু এ যুগে আমার মনে হয় তোমার পাপের যে-অংশ আমার ওপরে এসে পড়েছে, আমি তাকে অস্বীকার করতে পারি নে, এ পাপ, শুধু আমাকে নয়—আমাদের সন্তানেও বর্তাবে। তাই তফাতে থেকে তপস্যাই এখন আমার কর্তব্য। এর বেশী আমার কিছু বলবার নেই, কোন প্রার্থনাও নেই তোমার কাছে।"

এই চিঠির পর অজয় আর কোন উত্তর দেয় নাই বন্দনাকে, কোনও সংবাদও তার রাখে নাই। এই সময় নানা দিক্ দিয়া তাহার এরূপ প্রচুর অর্থাগম হইতে থাকে এবং সেই অর্থনৈতিক কাজের চাপ এরূপ বড়িয়া যায় যে, সাংসারিক কোন ব্যাপারেই মস্তিষ্ক-চালনার অবসর তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। যুদ্ধ মিটিয়া গেলেও যুদ্ধোত্তর কার্য-পরিকল্পনায় তাহাকে আরও নিবিড়ভাবে লিপ্ত হইতে হয়। প্রচুর অর্থাগমে তাহার পিতা এবং পরিজনবর্গের মতিগতিও এমনই উদ্ধত হইয়া উঠে যে, সাধারণ এক স্কুল-মাষ্টারের কন্যা যে কিছুকাল বধূরূপে এ-বাড়ীর সংস্পর্শে ছিল, তাহা স্মরণ করিতেও যেন ইহাদের বিবেকে বাধা পায়।

কিন্তু বন্দনার তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। স্বামীর বিপুল প্রতিষ্ঠা তাহাকে যেমন অণুমাত্র প্রলুব্ধ করে নাই, তথাকথিত ঐশ্বর্যের আবেষ্টনের বাহিরে আসায় নিজেকে বঞ্চিতা ভাবিয়া সামান্য বেদনাও পায় নাই সে। নিজের আদর্শে স্থির থাকিলেও আপনাকে স্বামীর অনাচারের অংশভাগিনী ভাবিয়া তাহার কৃচ্ছ্র-সাধনা একইভাবে চলিতে থাকে। কোন অতিলোভী মজুতদারের প্রসঙ্গ উঠিলেই বন্দনার সর্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠে, মনে হয় — যে অপরাধ সুস্পষ্ট হইয়া সমাজ ও আইনের সমক্ষে যাহাকে চিহ্নিত করিয়াছে, সেই অপরাধের অংশী ত তাহার স্বামীও! তার পর… শহরবাসীর লজ্জা নিবারণের ভারপ্রাপ্ত বস্ত্রব্যবসায়ীদের মধ্যে যাহারা জনসাধারণের ধৈর্যকে বিচলিত করিতেছে নানা ভাবে, স্বার্থে অন্ধ হইয়া সুবিধার সুযোগ লইয়া যে সব অর্বাচীন নরপশু স্বদেশবাসীর জীবনকে দুর্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে, তাহাদের প্রসঙ্গ উঠিলেই মানস-দৃষ্টিতে বন্দনা যেন দেখিতে পায় — ইহার মূলে রহিয়াছে তাহার স্বামী এবং তার কুখ্যাত প্রতিষ্ঠান। সেখান হইতেই এই চরম দুর্নীতি সংক্রামক ব্যাধির মত আত্মপ্রসার করিতেছে; বন্দনা যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছে, বরাদ্দ

বস্ত্রের অধিকাংশ গাঁটগুলি—দুর্ভিক্ষ-কালের চালের বস্তার মত—স্বামীর আবাস-ভবনে সংগোপনে সঞ্চিত হইতেছে, এবং সেখান হইতে চোরাবাজারে গিয়া তাহার তহবিল স্ফীত করিতেছে। সংগে সংগে শিহরিয়া উঠে বন্দনা; অনুভব করিতে থাকে সে—স্বামীর অনাচারের জীবাণুগুলি তাহার চর্মদেহে প্রবিষ্ট হইয়া পূত পিতৃশোণিত পর্যন্ত বিষাক্ত করিতেছে। অমনি আর্তস্বরে সে বলিয়া উঠে: রক্ষা করো ঠাকুর, এ পাপ শুধু স্বামীর নয়, আমারো; আমরা যে—স্বামি-স্ত্রী।

বহির্মহলের সুসজ্জিত ড্রয়িং-রুমে একাকী বসিয়া অজয় তাহার ডায়েরীখানা পড়িতেছিল।

পুরাতন ডায়েরী। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম বর্ষে ইউরোপ ও আফ্রিকায় চক্রশক্তির যখন বিজয়াভিযান চলিয়াছে, সেই সময় দাম্পত্য জীবনপথে অজয়দের যাত্রা শুরু হয়—আর প্রথম প্রেমের স্মৃতিকে স্মরণীয় করিবার উদ্দেশ্যে সেই দিন থেকেই রীতিমত ভনিতা করিয়া ডায়েরী লিখিতে থাকে সে। প্রায় তিনটি বৎসর বিপুল উদ্যমে এবং পরিপূর্ণ উৎসাহে এই কাজটি নিয়মিতভাবেই চালাইয়া যায়। তাহার পর, বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কাজের চাপে ডায়েরীর পাতা খাটো হইতে থাকে, ভনিতা কতিপয় শব্দে আবদ্ধ হইয়া ভূমিকার অর্থবাচক হয়; ক্রমশ তাহা প্রাইভেট কোডের আকারে এরূপ দুর্বোধ্য হইয়া উঠে যে, ডায়েরীর লেখক ছাড়া অন্যের পক্ষে শব্দগুলির অর্থ উপলব্ধি করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। কিন্তু ডায়েরীর সূচনা থেকে শুরু করিয়া দৈনন্দিন ঘটনা-পঞ্জির আলোচনা করিলে, এবং শেষের দিকের 'কোডে'র রহস্যজাল ভেদ করিতে পারিলে, একটা মানুষের মাত্র কয়টি বছরের জীবন ব্যাপিয়া

কি ভাবে আলো ও ছায়ার খেলা চলিয়াছে—মনোবৃত্তির উপর কিরূপ ঘাত-প্রতিঘাত পড়িয়াছে, তাহার এক বিস্ময়াবহ পরিচয় পাওয়া যায়।

দীর্ঘ তিনটি বছরের মধ্যে এভাবে নিবিষ্ট মনে পুরাতন ডায়েরী পড়া ত দূরের কথা, কারবার সংক্রান্ত কোন চিঠির আগাগোড়া এক নিশ্বাসে পড়িবার সময়টুকুও কোন দিন অজয় করিতে পারিয়াছে বলিয়া জানা নাই। চিঠির সংক্ষিপ্তসার শুনাইবার জন্য সেক্রেটারী রাখিতে হইয়াছে তাহাকে। তাহা ছাড়া, তিন বছরের ভিতর এই ঘরে এভাবে একাকী বসিবার অবসরও কোনদিন পায় নাই সে। ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে এমন সব কর্মী ব্যক্তিদের সমাগম হইয়াছে, যাহাদিগকে এড়াইবার উপায় নাই—প্রত্যেকেই আসে লক্ষ্মীর বাহন হইয়া। তার পর কর্মচারীদের ভীড়, টেলিফোনের অবিরাম ঝংকার ত আছেই। কিন্তু আজ তাহাকে রীতিমত কঠিন হইতে হইয়াছে। কাহারো সহিত দেখা হইবে না, চিঠিপত্র বা ফোন আসিলেও তাহাকে খবর দিবে না—দৃঢ়স্বরে এই আদেশ দিয়া এবং বাহিরে চাপরাশিকে মোতায়েন করিয়া ড্রয়িং-রুমে আসিয়াছে সে ডায়েরীর বাঁধানো খাতা কয়খানি লইয়া। এ বাড়ীতে এ ব্যাপারটি একেবারে অভিনব এবং অপ্রত্যাশিত। নীচের কর্মশালায় কর্মচারীদের চিত্তে বিস্ময়ের শিহরণ জাগে, মনিবের কর্ম-জীবনকে কেন্দ্র করিয়া কত কল্প-কথা পল্লবিত হইয়া উঠে।

পুরাতন ডায়েরীর প্রথম পাতাটি খুলিতেই মুক্তার মত আকারে গোটা গোটা অক্ষরে সাজানো শব্দগুলির উপর অজয়ের দৃষ্টি পড়ে। জার্মানীর বিজয় অভিযানের সংগে নিজের নব জীবনের অভিযান-পর্ব মনোজ্ঞ ভনিতায় লিখিয়া রাখিয়াছে :—

১৯৪০-এর ৯ই এপ্রিল আজ। ডেনমার্ক বিনা প্রতিবাদে জার্মানীর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে—রাষ্ট্র-জগতের স্মরণীয় দিন। বন্দনাও আজ

বিনা প্রতিবাদে আমার কাছে করেছে আত্মসমর্পণ। জার্মানীর বিজয় অভিযান সার্থক হোক, বন্দনার সাহচর্যে আমার জীবন-ব্রতও সিদ্ধির পথে চলুক। বন্দনার বাবা অমরনাথ বাবু দেশের বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন বুঝি আমার জীবনের সাধনাকে সার্থক করবার জন্যেই। * *

আমার বাবা ছাপোষা মানুষ। ছেলেদের উপার্জনের ওপরেই নির্ভর করে বাড়ীতে তাস পাশা খেলে নিরুদ্বেগে থাকতে চান। আমরা চার ভাই যা উপার্জন করি, এত বড় সংসার তাতে স্বচ্ছলভাবে চলে না। ডাইনে এনে বাঁয়ে তাকাতেই যায় ফুরিয়ে। অভাবের অন্ত নেই। তার ওপরে যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন বেড়েছে, প্রায়োজনীয় জিনিসের দর গেছে চড়ে। এ অবস্থায় আমার বিয়েকে উপলক্ষ করে চক্ষুলজ্জা কাটিয়ে যে পণ তিনি দাবী করেন বন্দনার বাবার কাছে, শুনে লজ্জায় আমার চোখ দুটো ছোট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য, শহরের এক নামী কলেজে কমাসের অধ্যাপনা করি শুনেই সরল ভদ্রলোকের মন যায় ভিজে। যদিও আমি লেকচার দিই কলেজে, জুনিয়ার লেকচারার আমি। বাবা কিন্তু সেটা বাড়িয়ে তাঁকে জানালেন যে, সেখানকার বিশিষ্ট অধ্যাপক আমি। বাবার এই বাড়ানো কথাটা আমারো বেশ পছন্দ হয়েছিল বৈকি! আর কথাটা নিছক মিথ্যেও তো নয়। কলেজের ক্লাসে ছেলেদের সামনে চেয়ারে একবার বসলেই ত আমরা অধ্যাপক হয়ে যাই! তবে এ কথাও সত্যি, ইংরাজীতে 'প্রফেসর' বলতে গেলে কথা যেন গলায় বেধে যায়, একটা সংকোচ জাগে। কিন্তু বাংলায় 'অধ্যাপক' কথাটা সচল হয়ে গেছে—বাধে না এখন আর। যাই হোক, কলেজের অধ্যাপক যেখানে বর, সেখানে বরের বাপের দাবী মিটাতে কনের ইস্কুল-মাষ্টার বাবা অগত্যা বাধ্যই হলেন। এতে মনটা একটু খচ খচ করে উঠলেও সেটা স্থায়ী হয় নি। জানি ত, অভাব-রাক্ষসী সংসারটার চারদিকে কি রকম হাঁ করে

আছে। সুন্দরী বধূর সংগে নানা রকমের অতি প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র, বস্ত্র, অলঙ্কার, তার ওপর হাজার তিনেক নগদ টাকা—এই যুদ্ধের বাজারে অভাবের সংসারে বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত প্রবেশ করে কতটা সুসার যে করেছে, সে ত কারুর অজানা নেই। কিন্তু বাড়ীর কেউই এজন্যে কন্যাপক্ষের কাছে কিছু মাত্র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে রাজী নন—এ যেন ওঁদের কর্তব্য, যেন ঋণী ছিলেন ঋণ পরিশোধ করেছেন। বরং খুঁত ধরে বক্রোক্তি করতে কসুর করেন নি,—আরো যদি কিছু আদায় হয়ে আসে। এতে কিন্তু আমার শিক্ষিত মন সায় দিতে পারে নি, তবে আপত্তি তুলতেও ভরসা করে নি। বন্দনার জন্যেই ভাবনা হয়েছিল, সে যদি কিছু মনে করে; কিন্তু আশ্চর্য, এ সব যেন তার গা-সওয়া ব্যাপার। মিষ্টি কথায় দিব্যি শান্তি জল ছাড়িয়ে দিয়েছে। মনে আশা জেগেছে, জীবনটা তাহলে শান্তিতেই কাটবে সহধর্মিণী যেখানে শান্তির প্রতিমা। * * *

পরের পাতাগুলিতে চোখের দৃষ্টি বুলাইয়া উল্টাইয়া চলে অজয়। একই ধরণের লেখা। প্রতিদিনের বর্ণনায় বন্দনাই অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া রাখিয়াছে। সেগুলির মর্মাংশ এইরূপ :—

আশ্চর্য মেয়ে এই বন্দনা। কিছুতেই বেজার নেই তার মনে। বাড়ীর চার বধূর মধ্যে বয়সে সে সবার ছোট, কিন্তু নিজের যোগ্যতায় সে যেন সবার ওপরে প্রমোস্থান পেয়েছে। ইশারায় যেন সে সব বুঝে নেয়, কার কি চাই, কেমন করে মন যোগাতে হয়—সে সবই যেন তার কণ্ঠস্থ হয়ে গেছে। অথচ, খোসামুদের মত কথা বলতেও সে অভ্যস্ত নয়, ভুল চুক কারুর হোলে এমনি করে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, যার ভুল —শোধরাবার পথ সে পায় না। বাড়ীর চেয়ে সুখ্যাতিটা ছড়িয়ে পড়েছে পাড়ার ভিতরেই বেশী করে; গিন্নী-বান্নীরা সবাইকে শুনিয়ে বলেন—হ্যাঁ, মেয়ে বটে ভটচায্যিদের বাড়ীর ছোট বউ, গতর ত নয়—যেন অরুণের রথ;

আর কি রকম আক্কেল-বিবেচনা—যেখানে জল পড়ে, অমনি যেন ছুটে গিয়ে ছাতা ধরে। এমন না হোলে বউ!...বাড়ীতে এত সুখ্যাতি না হলেও, যেটুকু শুনি—তাই কি চাট্টিখানি কথা নাকি? এ পর্যন্ত এ-বাড়ীতে এসে এর আগে কোন বউএর সঙ্গেই মাকে কোন দিন হেসে কথা কইতে দেখিনি। বউদের সামনে সর্বদাই মুখখানা এমনি ভার করে থাকেন—যেন কত বেজারই হয়েছেন। আর চোখ দুটো যেন লাটিমের মত ঘুরতে থাকে—কোথায় কি ভুলটুকু হয়েছে সেটা ধরবার জন্যে। এ অবস্থায় বউ-বেচারীরা কি-যে করবে ভেবেই ঠিক করতে পারে না, তাদের হাত পা যেন আপনিই জড়িয়ে যায় ভয়ে। কিন্তু বন্দনা এ বাড়ীতে এসেই এ-হেন শাশুড়ীর মুখেও হাসি ফুটিয়ে তবে ছেড়েছে।

কালকের কথাই লিখছি। সকালে বউরা সব রান্নাঘরে কাজে ব্যস্ত; কেউ রাঁধছে, কেউ কুটনো কুটছে, কেউ বাটনা বাটতে লেগে গেছে, কেউ বা ছেলে নিয়ে বসেছে, এমন সময় মুখখানা গোঁজ করে মা সেখানে এলেন। বউরা ভাবলে,—এই হোল, এখনি গজগজানি শুরু হবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, বন্দনা বড় জায়ের দুরন্ত ছেলেটাকে তখন ভোলাচ্ছিল, মাকে দেখেই তাড়াতাড়ি উঠে জানালার কাছে একখানি পিঁড়ে পেতে দিয়ে মায়ের হাত ধরে মিনতির ভঙ্গিতে বললো—মা, পিঁড়ি পেতে দিয়েছি, আপনি নাতিকে কোলে নিয়ে এখানে বসুন আর আমাদের কাজের তদারক করুন। ভুলচুক হলেই বলে দেবেন, আমরা শুধরে নেব।

এমন আগ্রহের সুরে আর অন্তরের টানে হাতখানি ধরে এক রকম জোর করেই মাকে পাতা-পিঁড়িতে বসিয়ে দিল বন্দনা যে, তিনি আপত্তি করবারও ফুরসদ পেলেন না। তার পরেই বড় বৌদির কোলের বাচ্চাটিকে মায়ের কোলের ওপর দিয়ে হাসতে হাসতে বললো—দেখুন মা, খোকার

মুখখানা—কি রকম ভারিক্কি হয়ে বসেছে, আর চোখ দুটো পাকিয়ে ওর ধমকাবার ধরণ যদি দেখেন—ঐ যেন দিদা!…

খোকার গম্ভীর মুখখানার পানে চেয়েই হেসে ফেললেন মা, খোকার মুখে চুমো খেয়ে বললেন, হ্যাঁরে দুষ্টু, কাকীমা বলে কি? দিদার কাছে ধমকানি শিখেছ—দিদা বুঝি খালি খালি ধমকায় রে?…

বন্দনা অমনি খপ করে কথাটা সামলে নিয়ে খোকাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলো: বল ত বাবা, হ্যাঁ ধমকায় ত—বড়ো হলেই ধমকাতে হয়; নৈলে ছোটরা টিট থাকবে কেন, আর সব শিখবেই বা কি করে—মাথার ওপরে ধমকাবার লোক না থাকলে?…

পরক্ষণেই সুরটা পালটে নরম করে মাকে জানালো: দেখুন মা, আমার মনে হয় এই রান্নাঘরটা যেন আমাদের পাঠশালা, আর রান্নাবান্না, হেঁসেল গুছানো, কাজকর্ম করা—এগুলো সব আমাদের যেন পড়া।

হাসতে হাসতে মা বলেন:—তাই বুঝি আমাকে পিঁড়ি পেতে বসিয়েছো বাছা তোমাদের গুরুমশাই করে?…

কথার সঙ্গে সঙ্গে মায়ের মুখে হাসি যেন আর ধরে না! এই দুর্লভ বস্তুটির দর্শন পাওয়া এ বাড়ীর বধূদের অদৃষ্টে বড় একটা ঘটে না, তারা অবাক হয়ে ভাবে—এ হোল কি?…

বন্দনা অমনি খপ করে জবাব দিল: আপনি ঠিক বলেছেন মা, এ পাঠশালায় আপনি ছাড়া আর কে গুরুমশাই হতে পারে, আর আপনার মত যত্ন করে কে আমাদের পড়াবেন শেখাবেন, বলুন ত?…

মা তখন হাসতে হাসতে বললেন: শোন কথা, পণ্ডিতের মেয়ে কিনা, তাই আমাকেও পণ্ডিত বানাতে চায়!…

পাতার পর পাতার গায়ে কালির আঁচড়ে গৃহস্থালী ব্যাপারে বন্দনার এমনি কত গুণপনার কাহিনীই রূপায়িত হইয়াছে। পড়িতে

পড়িতে অজয়ের দুই চক্ষু যেন অশ্রুতে ভরিয়া আসে। পরবর্তী একখানা ডায়েরীর একটা পাতায় বন্দনার সঙ্গে নিজের সংলাপটি চোখে পড়িয়া যায়। কলেজের ছেলেদের প্রসঙ্গে রাত্রে স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে সেদিন এই ভাবে আলাপ হইয়াছিল :

বন্দনা : তাহলে কলেজের ক্লাসে বইয়ের পড়া আর লেকচার ছাড়া অন্য সব কথারও আলোচনা হয়, বলো ?

অজয় : কলেজের ছেলেরা শুধু বইয়ে মুখ গুঁজে প্রফেসরের লেকচার শোনবার পাত্রই বটে! যে প্রফেসরের পিরিয়ডে যত বেশী বাইরের কথা আলোচনা হয় সেই প্রফেসরকেই ছেলেরা তত বেশী পছন্দ করে।

বন্দনা : কি সব আলোচনা হয় বল না ?

অজয় : এই আজকের কথাই তাহলে বলি। ক্লাশে তর্ক বাধলো সাম্যবাদী রাশিয়াকে নিয়ে। Wishful thinking এর খৈ ফোটাতে লাগল ছেলেদের মুখে। যুদ্ধের শুরু থেকে নানা বিশ্লেষণের পর শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠ মতটা দাঁড়াল এই—সোভিয়েট রাশিয়াও আস্তে আস্তে সাম্যবাদের রাস্তা ছেড়ে সাম্রাজ্যবাদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বন্দনা : তুমি কি মত দিলে ?

অজয় : একটি ছাত্রী আমার মতটি জানিয়ে দিলে।

বন্দনা : ছাত্রী! তোমাদের কলেজে তাহলে মেয়েরাও পড়ে নাকি ?

অজয় : নিশ্চয়। ঐ ক্লাসে পাঁচটি মেয়েও কমার্স পড়ে। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে ভারি মুখরা। এর পর সে-ই হঠাৎ বলে উঠলো—'আপনাদের সব কথাই শুনলাম কিন্তু কোন কথাই কানে এসেও মনে ঢুকল না।' ছেলেদের মধ্যে যে ছেলেটি চাঁই গোছের, জিজ্ঞাসা করল—

'কেন' ? মেয়েটি উত্তর করল—'কস্মিন কালেও যারা মেয়েদের মুক্তি দেয় নি, আর দিতেও পারে না, আপনারা এতক্ষণ তাদের সেই সব পুরাণো তত্ত্ব কথাগুলোর ফাঁকা আওয়াজই শোনালেন।'

বনন্দা : বা ! মেয়েটি বেশ স্পষ্টবক্তা ত ! তারপর, কি দাঁড়াল ?

অজয় : ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল—আপনি কি তাহলে সোভিয়েট রাশিয়ার জয় কামনা করেন ?' মুখখানা এবার শক্ত করে মেয়েটি জবাব দিল—'নিশ্চয়। রাজনীতি বা সমাজনীতির অত সব সূক্ষ্ম কথা বুঝিনে, বুঝতে চাইও নে। আমি শুধু এই কথাটাই বুঝি—এই যুগে সারা জগতের মাঝে যে দেশ আর যে সমাজ নারীকে সত্যিকার মুক্তি দিয়েছে, আজ তার পরাজয় মেয়ে হয়ে আমি কেমন করে কামনা করব ?'

কথাটি শুনিয়া কি আনন্দ বন্দনার ! সেই সঙ্গে স্বামী গর্বে অন্তরটি তাহার ভরিয়া উঠে যেন। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠে সে : বাবার কথা সবই সত্য হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন—মা, আমরা বালক আর কিশোরদের মন নিয়ে নাড়া চাড়া করি ইস্কুলে। কিন্তু যাঁরা কলেজের ছেলেদের অধ্যাপনায় ব্রতী, তাঁরা আরো ভাগ্যবান্ : জাগ্রত যৌবনের ভরা জোয়ারের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের করতে হয় কর্তব্য পালন। ইস্কুলের ছেলেদের গল্প শুনেই খুসি হয়েছো এতদিন, এরপর কলেজের গল্পের মধ্যে কত নতুন বস্তুর সন্ধান পাবে !

ইহার পর ছাত্র ছাত্রীদের কত রকমের কত আখ্যানই ডায়েরীর পাতায় রূপায়িত করিতে হইয়াছে অজয়কে।

* * * *

১৯৪৩এর ডায়েরীর পাতায় একটি শব্দে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইতেই অজয় চমকিয়া উঠিল। শব্দটি হইতেছে—ইনফ্লেশন। পাশেই ব্রাকেটের মধ্যে লেখা আছে "মুদ্রা-স্ফীতি" বিদেশী কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ।

অমনি ঝাঁ করিয়া অজয়ের মনে পড়িয়া গেল, কি এক মাহেন্দ্রক্ষণেই এই বিষয়টি লইয়া সে আলোচনা শুরু করে এবং বিষয়বস্তুটি কিভাবে তাহার অদৃষ্টে সার্থক হইয়া উঠে। শহরে তখন অন্ন বস্ত্রের সমস্যা এক গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব করিয়াছে। শহরবাসীর অভাব মিটাইবার জন্য সরকার শহরের বিভিন্ন অংশে ডজন দুয়েক দোকান খুলিয়া সমুদ্রে পাদ্যার্ঘ্য দিয়াছেন মাত্র—জনসাধারণের অভাব মিটাইতে পারিতেছেন না। চাউলের মূল্য দিনের পর দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অতিরিক্ত মূল্য বৃদ্ধির জন্য গবরমেণ্ট অতিলোভী ব্যবসায়ীদিগকে দায়ী করিতেছেন, অথচ ইহাদিগকে জব্দ করিবার ক্ষমতা এক মাত্র গবরমেণ্টের হাতে থাকা সত্ত্বেও গবরমেণ্ট নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে, নানা সূত্রে প্রকাশ পাইতেছে যে, ভারতরক্ষা আইনের দোহাই পাড়িয়া গবরমেণ্টই প্রচুর পরিমাণে চাউল মজুত করিয়া এই জটীল অবস্থা সৃষ্টির উপলক্ষ হইয়াছেন। আবার, ঠিক এই সময় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে কোন স্পষ্টবাদী সদস্য বলিয়া ফেলিলেন যে, আর ঢাকাঢাকি করিয়া কোন লাভ নাই—গবরমেণ্টও স্বীকার না করিয়া পারিবেন না যে, ভারতবর্ষেও ইনফ্লেশন শুরু হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এখন হইতে সরকারের সতর্ক হওয়া উচিত, চোখ বুজাইয়া দেদার নোট ছাপানো অবিলম্বে বন্ধ করা হউক। অজয় যেখানে অর্থনীতির অধ্যাপক, এগুলি তাহারই আলোচনা করিবার কথা। বিশেষত, কলিকাতার অধিবাসীরূপে চাউলের ব্যাপারে সেও অল্পবিস্তর ভুক্তভোগী, তার পর ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি এবং ইহার সহিত যে-সকল অতিলোভী ব্যবসায়ী সংশ্লিষ্ট, অজয়ের ন্যায় শিক্ষাব্রতীর পক্ষে তাহাদিগকে সহ্য করা কখনই সম্ভবপর নহে। এই সুযোগে অজয় নীতিশাস্ত্রগুলি মন্থন করিয়া উপাদান সংগ্রহে তৎপর হইয়া উঠিল। উদ্দেশ্য, মজুত ব্যাপারে সরকারী নীতি,

ইনফ্লেশন ও অতিলোভের ফলে মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কলেজে লেকচার দিয়া ছাত্রমহলে খ্যাতিলাভ করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সময়োপযোগী বক্তৃতাগুলি সংবাদপত্রে ছাপাইয়া সুবিখ্যাত হইয়া উঠিবে। ইহার ফলে কি ভাবে অজয়ের অদৃষ্টের চাকা ঘুরিয়া যায়, ডায়েরীর পতাগুলি পর পর পড়িলেই জানা যাইবে।

এ সম্পর্কে ডায়েরীর বর্ণনা এইরূপ :

আশ্চর্য, কেতাবগুলো ভালো করে ঘাঁটলে কত দরকারী জিনিসই পাওয়া যায়, আর সেগুলো একটু কায়দা করে ছড়াতে পারলে পরিশ্রমের মূল্য কত সহজেই উসুল হয়ে আসে! চালের ব্যাপারে কি কম বিড়ম্বনা ভোগ করা গেছে! কোনদিন কি কখনো ভেবেছিলাম—ক্যাম্বিসের থলি হাতে করে কন্ট্রোলের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আড়াই সের চালের জন্যে উমেদারী করতে হবে? 'কিউ' দিয়ে দাঁড়াবার দুর্ভোগ কাটাতে নানা রকমের ফন্দী বার করতে হবে মাথার মধ্যে থেকে? এ অবস্থায় মাথার মধ্যে রোষের আগুন ত জ্বলবেই। কাজেই দোকানদার থেকে সুরু করে আড়তদার, মজুতদার; কন্ট্রাক্টর, শেষ সরকার পর্যন্ত—সবাইকে দায়ী করে যুক্তির ফোয়ারা ছোটাতে থাকি। অগ্নিবর্ষী বক্তৃতা শুনে ছেলেরা একেবারে তন্ময়, পিরিয়ড শেষ হলেও তারা ক্লাস ছাড়তে চায় না, বলে—আরও বলুন স্যার, বিউটিফুল আইডিয়া। গম্ভীর মুখে তাদের বলি—রবিবারের অমৃতবাজারে ছেপে বেরুবে, প'ড়ো।

বাড়ীতে ফিরে বন্দনাকে বলি সব। শুনতে শুনতে মুখখানা তার লাল হয়ে ওঠে আহ্লাদে। গত ক' মাস ধরেই সংসারে নানারূপ অশান্তি ঘনিয়ে উঠেছে চাল, চিনি, কেরোসিন, কয়লাকে উপলক্ষ করে। যার যেখানে যতটুকু ক্ষমতা, কোথায় কার সঙ্গে কিরূপ দহরম মহরম আছে—সুপারিশের জোরে—ভিড়ে ভিখিরীদের সামিল হয়ে দাঁড়াবার দুর্ভোগ

কাটিয়ে প্রাপ্তির ব্যাপারে সুসার হতে পারে—এ সব দিকে বাড়ীর প্রত্যেক সমর্থ পুরুষকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু এত সব করেও যে আশানুরূপ ফললাভ হয়েছে, এ কথা জোর করে বলা যায় না। এমন কতদিনই স্মরণীয় হয়ে আছে—কয়লার অভাবে উনান ধরে নাই, চিনির বদলে আখের গুড়েই চায়ের পাট সারতে হয়েছে। পরিধেয় বস্ত্রের অভাবে বধূদের চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠেছে। একেবারে অজ্ঞাত ও অপরিচিত এই সব অভাব এক একটা কদর্য মূর্তি ধরে সংসারের মধ্যে যেন প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেশী কথা কি, এমন যে ধৈর্যশীলা বন্দনা—সেও যেন মুষড়ে পড়েছে একেবারে নতুন ধরণের এই সব অভাবের অবিরাম আঘাতে। আমার ত অজানা নয়, তার জীবনে একটি মাত্র বিলাস ছিল—পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড়খানি পরে একটা শান্ত শ্রী ফুটিয়ে তোলা। কিন্তু তিন মাস পূর্ণ হতে চললো—এ বিলাসও তাকে বর্জন করতে হয়েছে। তিনটি সপ্তাহ ধরে চিহ্নিত সরবরাহকারীদের দোকানে দোকানে ধর্ণা দিয়েও বন্দনার জন্য এক জোড়া শাড়ী সংগ্রহ করতে পারিনি। কলেজের পাল্‌টা আজও কয়েকটি দোকানে ব্যর্থ চেষ্টাই করেছি। শাড়ীর প্রসঙ্গটি চাপা দিবার অভিপ্রায়েই কলেজের ক্লাসে সরকার ও সরবরাহকারীদের বিরুদ্ধে জোরালো লেকচার দিবার কাহিনীটি তুলেছিলাম।

বন্দনা যেন সর্বান্তঃকরণে এমনি একটা আপত্তি সোৎসাহে শোনবারই প্রত্যাশা করছিল। কেন না, প্রসঙ্গটা শুনে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েই জানালো যে—সত্যিই, ক'দিন ধরেই ভাবছিলাম আমি, এর কি কোন প্রতিকার নেই? যুদ্ধের দোহাই দিয়ে যে সব অত্যাচার চলেছে, এর প্রতিবাদ ত কেউ করছে না। দেখ, বিয়ের পর থেকে মনে প্রাণে আমরা এক হয়েছি কি না, তাই আমার মনে যে ব্যথা বেজেছে, তোমার মনের

তারেও সেটি এমন করে ঝংকার তুলেছে। লক্ষীটি, কথাগুলো খবরের কাগজে ছাপিয়ে দিয়ো, দেশের লোকের চোখ ফুটুক......

এই পর্যন্ত পড়িবার পর অজয়ের স্বর যেন সহসা ধরিয়া আসিল, চোখের পাতাগুলিও যেন অশ্রুতে ভিজিয়া ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল ; ফলে ইহার পরের কথাগুলি আর যেন বাহির হইবার পথ পাইল না। খাতার পাতাটির পানে ভাবার্দ্র দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সে চাহিয়া রহিল—সংগে সংগে চক্ষুপ্রান্ত দিয়া মুক্তার মত বড় বড় গুটিকয়েক অশ্রুবিন্দু গণ্ড বাহিয়া গড়াইয়া পড়িল।

* * *

নীরবেই কয়েকখানি পাতা উল্টাইয়া গেল অজয়। এবার চোখে পড়িল ইংরাজী ও বাংলা কাগজে মুদ্রিত চাউলের মূল্য নামাইয়া আনিবার উপায় সম্পর্কে তাহারই রচিত প্রস্তাবটির কাটিংস। সেগুলি ডায়েরীর পাতায় পর পর আঠা দিয়া আঁটিয়া রাখা হইয়াছে ; লেখার নিচে প্রস্তাবকারীরূপে তাহার নাম ও ঠিকানা ছাপার অক্ষরে জ্বল জ্বল করিতেছে।......বিবিধ অকাট্য যুক্তি দ্বারা যে প্রস্তাবগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে, এক নজরে সেগুলি একবার পড়িয়া লইল অজয়।

চাউলের মূল্য নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সরকারী হুকুমনামার দোষগুলি দেখাইয়া অজয় যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছে, সরকারের আদেশ-মূলক ব্যবস্থার ফলে অতিলোভী ব্যবসায়ীরাই ফেঁপে উঠবে, আর ক্রেতাদের অবস্থা আরো শোচনীয় হবে। বাংলা সরকার এ ব্যাপারে এখোনো ভুলের পথে চলেছেন। সরকারের উচিত হচ্ছে ব্রিটিশ গভর্ণ-মেণ্টের বিনিময় হার নিয়ন্ত্রণ ফণ্ড (Exchange Equalisation Fund) যে ভাবে চালানো হয়, সেই ভাবেই কাজ চলতে থাকলে কলকাতার

বাজারে চালের দাম কনট্রোল করা সম্ভব হবে। এই সঙ্গে বাংলা দেশের জেলা থেকে জেলান্তরে চালের চলাচল বা আনানো-পাঠানোর সম্পর্কে যে সব বাধা-নিষেধ আছে, সব তুলে দিতে হবে। বাইরে রপ্তানীর পথ একবারে বন্ধ করা চাই। তার পর চোরাবাজারের ব্যাপারে সরকারকে চণ্ড নীতির চাবুক নিতে হবে হাতে। এ ক্ষেত্রে দোষী বে-সরকারী হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত, আর সরকারী কর্মচারীর দুর্নীতি ধরা পড়লে তাকে বরখাস্ত করে তার প্রভিডেণ্ট ফণ্ড বাজেয়াপ্ত করে সেই টাকা ক্রেতাদের সুসারে দেওয়া হোক। যেহেতু, ক্রেতাদের মাথাতেই কাঁঠাল ভেঙ্গে এরা আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে।

স্বরচিত প্রস্তাবগুলি পড়িতে পড়িতে ক্ষণকাল পূর্বের অন্তর্নিহিত গভীর বেদনাটুকু বুঝি হাল্কা হইয়া গিয়াছিল, তাই অজয়ের ওষ্ঠপ্রান্তে হাসির ঝিলিকটুকু বিজলীর রেখার মতই ফুটিতে দেখা গেল। নীরবে পরপর আরও কয়েকখানি পাতা উল্‌টাইয়া চলিল অজয়। একটু পরেই একখানি পাতায় পুনরায় তাহার দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল। রুদ্ধ নিশ্বাসে অজয় পড়িতে লাগিল :

কাগজওয়ালারা আমার লেখাটা ছেপেছেন, প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করবার জন্যে বাংলা সরকারকে সুপারিস পর্যন্ত করেছেন। কিন্তু তার পরেই বোধ হয় সেটা চাপা পড়ে গিয়েছে। কেননা, কোন উচ্চবাচ্চই আর শুনিনি। আমার লেখা নিয়ে ছেলেরা যে কলেজটাকে খুব সরগরম করে তুলেছে, সে ত নিত্যই চোখে দেখি। এই নিয়ে কে কি বলে—সে সব কণ্ঠস্থ ক'রে শোনাতে হয় বন্দনাকে রাতের খাওয়ার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে যখন শয়ন কক্ষে আসে। বাড়ী শুদ্ধ সকলে যখন গভীর ঘুমে অচেতন, দুটি বিনিদ্র দম্পতির প্রাণ-খোলা আলাপে আমাদের ঘরখানি মুখরিত হয়ে ওঠে।

বন্দনা বলে : সত্যি, তোমার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কথা শুনতে ভারি ভাল লাগে ; কি বলবো, আমাদের বাড়ীতে তেমন জায়গা নেই, আর

সে রকম সচ্ছল অবস্থাও নয়, নৈলে মাঝে মাঝে তাদের নিমন্ত্রন করে এনে নিজের মুখে সব শুনতুম।

বন্দনার কথা শুনে বুকের ভিতরটা যেন টন টন করে ওঠে—চাপা নিশ্বাস একটা সজোরে বেরিয়ে আসে ;

ইহার পরের পৃষ্ঠাটি লাল পেনসিলের দাগ দিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখা হইয়াছে। অজয়ের চোখ দুটি সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল এবং এই ভাবিয়া মনে মনে একটা অস্বস্তি বোধ করিল যে, ডায়েরী পড়ার নেশায় ধূমপানের নেশাকে ভুলিয়া গিয়াছে সে। এতক্ষণে অন্তত আধ ডজন সিগার ভস্ম হইয়া যাইত। স্বর্ণ খচিত অপরূপ সিগার কেস পকেটেই ছিল, ক্ষিপ্র হস্তে বাহির করিয়া ধোঁয়া ছড়াইতে ছড়াইতে আপনাকে যেন অবসাদমুক্ত করিয়া লইল অজয়। টেবিলের উপরেই ডায়েরীর চিহ্নিত পাতাটি খোলাই পড়িয়াছিল, পুনরায় তাহাতে দৃষ্টিসংযোগ করিল।

এদিনের পাতাটির প্রথমেই একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা :

ভাগ্যোদয়ের একি সুযোগ এল আমার জীবনে মনগড়া একটা লেখাকে উপলক্ষ করে ? অর্থনৈতিক ব্যাপারে কত রকমের কত লেক-চারই ত দিয়ে আসছি কলেজে, তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে চর্চা হলেও কলেজের বাইরে তার রেশ গিয়ে কোনদিন পৌছেচে বলে ত জানা নেই। কিন্তু হঠাৎ একি হোল,—বর্তমান যুদ্ধ সম্পর্কে অসংখ্য অভাব অসুবিধার জাঁতায়-পেসা মন আর বুদ্ধি দিয়ে গড়া গোটা কয়েক 'থিওরি'র প্যাঁচ যে এমন সাংঘাতিক হয়ে শহরের সেরা এক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে টলিয়ে দেবে—তা কি কল্পনাও করতে পেরেছিলুম ?

সেদিন সকাল থেকেই সাংসারিক নানা ব্যাপারে কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম, প্রথমেই মন বিগড়ে যায় চিনির অভাবে

গুড় দেওয়া চা গিলে! তারপর খেতে বসেই বাধে বিভ্রাট, ভাতের সংগে কাঁকর চিবুতে শক্ত একটা দাঁতই নড়ে উঠে।

সেই সময় বাইরের ছোট ঘরখানায় বসে বাবা তখন ছেলেদের উদ্দেশে গজগজ করছিলেন: 'পাড়ার সবাই দেখি সুপারিশ ধরে কত রকমের কত কিছুই দিব্যি বাগিয়ে আনছে, আমার সংসারের কথা আর বোল না, চার চারটে ছেলে, কারও যদি কিছু মুরোদ আছে! ঝাড়ু মারো ওসব বাঁধা মাইনের চাকরীর মাথায়—ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না, ওর চেয়ে, এ, আর, পি,র লোকেরাও বেশী কামায়; ওরা যে-সব র‍্যাশন পায়, আমরা তা চোখেও দেখি নে।

কথাগুলোর পোঁ ধরে ভাঁড়ারঘর থেকে মাকেও বলতে শোনা গেল: 'শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে দু'বেলায় পড়ে ত্রিশখানা পাতা' ছেলেরা ত বরাদ্দ টাকা দিয়েই খালাস, কিন্তু আমি করি কি—আর উনিই বা বুড়ো মানুষ কত করবেন? পেটের কথা না হয় ছেড়েই দিলুম, কিন্তু পরণের যা হাল হয়েছে—ছেলেদের সামনে বেরুতেও লজ্জা করে, এক একবার ইচ্ছে হয় গলায় দড়ি দিয়ে সব যন্ত্রণার হাত ছেড়ে পালাই। বরাত বরাত!

খেতে বসে এসব কথা কানে ঢুকে মনটিকেও পলকে যেন বিষিয়ে দিলে। কিন্তু ওঁদের মনের ক্ষোভ ছেলেদের জানিয়ে যে কোন লাভ নেই—তারাও যে সত্যিই অক্ষম, সে কথা কে তাঁদের বোঝাবে?

কলেজে এসেও অন্যদিনের মত মন খুলে আজ লেকচার দিতে পারিনি, ছেলেরা হয়ত ভেবে নিয়েছে, স্যারের শরীরটা ভাল নেই, তাই লেকচার বেশ জমছে না। সকালের কথাগুলি সত্যিই কাঁটার মত খচ খচ করে বিঁধছিল যেন…

বন্দনার শাড়ী এক জোড়া কেনবার জন্যে দশ টাকার একখানা নোট ট্রামের টিকিট-কেসের খাপের মধ্যে রেখে কয়েক হপ্তা ধরে বৃথাই ঘোরা-

ঘুরি করেছি দোকানে দোকানে। যদিই হঠাৎ কোনদিন শাড়ীর হদিস পাই আর টাকার অভাবে কেনা না হয়, সেই ভয়ে নোটখানা আর ভাঙাতে সাহস করিনি। টিফিনের সময় কমন রুমে একটি ছাত্রের কাছে খবর পেয়েছি, কটন ষ্ট্রীটে এক মাড়োয়ারীর প্রতিষ্ঠান নাকি কনট্রোল দরে ঢাকেশ্বরী মিলের সাড়ী দিচ্ছেন, মালিক লোকটি খুব ভদ্র, ভদ্রলোকের মান রেখে ব্যবস্থা করেন—লাইনে তাঁদের দাঁড়াতে হয় না। তখনই আগ্রহ জাগ্রত হোল যে, শাড়ী যদি সত্যিই পাই—মায়ের পায়েই প্রণামী দেব, তাঁর ইচ্ছা হয়, তা থেকে একখানা বন্দনাকে দেবেন। সকালের কথাগুলোর ব্যথা তখনো পর্যন্ত মনকে আড়ষ্ট করে রেখেছে।

একটা পিরিয়ডের আগেই কলেজ থেকে বেরুবার উদ্যোগ করছি, এমন সময় বেয়ারা এসে জানালো : কমন রুমে এক ভদ্রলোক বসে আছেন, দেখা করতে চান। জরুরী কথা আছে তাঁর নাকি আমার সঙ্গে।

বিস্মিত হলাম বৈকি ; কি এমন জরুরী কাজ কার পড়লো যে কলেজেই ছুটে এসেছেন দেখা করতে ; আর, আমার সঙ্গেই বা সে-কাজের কি সম্বন্ধ? যাই হোক, কৌতূহলের সঙ্গেই কমন রুমে গিয়ে হাজির হলাম।

বেয়ারা আঙুল বাড়িয়ে যে লোকটিকে দেখিয়ে দিয়ে চলে গেল, তিনি তখন একখানা চেয়ারে বসে নিজের মনেই নোটবুকে কি লিখছিলেন। মনে হ'ল,—হ্যাঁ, কাজের মানুষ বটে! লোকের সংগে দেখা করতে এসেও নিজের কাজটুকু ভোলেন নি। কিন্তু এক নজরে মানুষটির চেহারা আর সাজগোজের কায়দা দেখে তাঁকে কোন বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেই মনে হোল। দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স বড় জোর বত্রিশ, আমারই প্রায় সমবয়সী। পরণে দামী কোট প্যাণ্টলুন, বাম হাতের রিষ্টওয়াচ আর ডান হাতের পার্কার পেনটি যুগপৎ আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করলো। সুদৃশ্য ও দুষ্প্রাপ্য 'হ্যাট'টি কোলের ওপর রেখে বেশ নিবিষ্ট মনেই নেটবুক লিখে চলেছেন।

কাছে গিয়েই আমাকে বলতে হোল : আপনি কাকে খুঁজছেন স্যর ?

যন্ত্রচালিতের মত সোজা হয়ে উঠে তিনি বললেন : আপনাকে স্যর ! আপনিই ত মিষ্টার অজয় ভট্টাচার্য ?...সঙ্গে সঙ্গে পেনটি কোটের বুক পকেটে রেখে হাতখানি বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই আলাপ হয়ে গেল ভদ্রলোকের সংগে। যেমন তাঁর ঝকঝকে চেহারা ও চকচকে সাজ পোষাক, তেমনি দেখলাম কাজেও চটপটে। নাম বললেন—স্বর্ণ দত্ত, একটা বড় সওদাগরি অফিসের মুৎসুদ্দি। খবরের কাগজে সম্প্রতি চালের ব্যাপারে সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সমালোচনা বেরিয়েছে, তা নাকি ওঁর ভারি ভাল লেগেছে। এখন হয়েছে কি, আফিসের যিনি মালিক, মস্ত লোক, টাকার কুমীর বিশেষ, তাঁর ছেলে ইদানীং অর্থনীতিতে হাত-মক্স করছে, তার জন্যেই দরকার হয়েছে একজন করিৎকর্মা গোছের মাষ্টার, মোটা মাইনে দেবেন তিনি। মালিকের ছেলে ঝোঁক ধরেছেন, এমন জোরালো লেখা যাঁর কলম দিয়ে বেরিয়েছে, তাঁর কাছেই সাকরেদী করবে সে। মিষ্টার স্বর্ণদত্তই আমার পাত্তা খুঁজে বার করেছেন, এখনি তাঁর সঙ্গে গিয়ে কথাটা পাকা করে তাঁর মুখখানা রাখা চাই।

এমন একটি শাঁসালো গোছের টুইসানের ব্যাপারে মনে উৎসাহ জাগলো বৈকি, কিন্তু তখনি চোখের সামনে ভেসে উঠল কটন ষ্ট্রীটের সেই মাড়োয়ারী প্রতিষ্ঠান, সেই সঙ্গে এক জোড়া দুর্লভ শাড়ী। কাজেই বলতে হোল তাঁকে : ঠিকানাটা আপনি দিয়ে যান, কাল বিকেলে কলেজের পর দেখা করব আমি।

মিঃ দত্ত কিন্তু শক্ত হোয়েই বললেন : শুভস্য শীঘ্রম্ ; আবার কাল কেন, এখনি চলুন না স্যর ?

আমাকেও ততোধিক শক্ত হয়ে তখনি উত্তর দিতে হোল: জরুরী একটা কাজেই এখন চলছি। বেশ ত, কালই কথাবার্তা হবে।

ভদ্রলোক যেন একটু অসহিষ্ণু হয়েই বললেন: আপনার জরুরী কাজটা কালকের জন্যে মুলতুবি রাখলে হয়না স্যর?

একটু তিক্ত স্বরেই জানিয়ে দিলাম: না স্যর, আজকের কাজ মুলতুবি রাখবার নয়। শাড়ীর সন্ধানে চলেছি, আজ না গেলেই ফস্কে যাবে। জানেন ত, চাল কাপড়ের চেষ্টা এখন সব কাজের ওপরে।

কথা শুনেই ভদ্রলোক একবারে লাফিয়ে ওঠবার মত হোয়ে উৎসাহের স্বরে বললেন: আরে মশাই আগে এ কথা বলতে হয়! যেখানে নিয়ে যেতে চাইছি আপনাকে চাল কাপড়ের মইমাড়ন হচ্ছে সেখানে, কত চান? কনট্রোলের দোকানে উমেদারী করে পাবেন ত ঐকখানা—বড় জোর এক জোড়া। আর আমাদের ওখানে আজ যদি কথা পাকা হয়ে যায়—কনট্রোলের সব কিছুই পায়ে হেঁটে আপনার বাড়ী গিয়ে হাজির হবে। তাহলে আর কথা নয়—চলুন।

এর ওপর আর কি কথা হতে পারে? চাকরি করতে গিয়ে যদি নিত্য প্রয়োজনের জিনিষগুলি কন্‌ট্রোলের দরে পাওয়া যায়,—সে কি সহজ কথা? নীরবেই মিঃ দত্তের অনুসরণ করতে হোল।

কলেজের ফটক থেকে বেরুতেই দেখি—জমকালো উর্দীপরা এক পাঞ্জাবী সোফার মোগলাই কায়দায় আমাদের দুজনকেই কুর্ণিশ করে ফুটপাথের গায়ে দাঁড়ানো প্রকাণ্ড মোটরখানার দরজাটি খুলে দিয়ে মোটরে ষ্টার্ট দিলো। মিষ্টার দত্ত আমার হাত ধরে সাদরে ভিতরে বসিয়ে দিয়ে তারপর নিজে বসলেন আমার পাশে। মোটরের গতির সংগে সংগে আমার কল্পনার গতিও উদ্দাম হয়ে ছুটলো।

বিরাট প্রতিষ্ঠান। আশে পাশের ও সামনের ক'খানা বড় বড় ইমারতকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে এই বিশাল বিপণী। চার দিকে লোকজন গিস্ গিস্ করছে ; হঠাৎ দেখলে মনে হয় সারা ভারতের সকল সমাজ ও সম্প্রদায়ের কর্মী মানুষগুলি এখানে যেন জোট পাকিয়ে কর্মচাঞ্চল্যের তরঙ্গ তুলেছে শহরবাসীর প্রাণে। লরি বোঝাই হয়ে আসছে কাপড়ের গাঁট, চালের বস্তা, কেরোসিনের টিন, চিনির ব্যাগ— আরো কত কি!

অজস্র আদর আপ্যায়নের সংগে প্রচুর জলযোগে পরিতৃপ্ত করে কাজের কথা পাড়লেন মিষ্টার দত্ত। প্রথমেই জানালেন : বাসন্তী মিলের একষ্ট্রা স্পেস্যাল কোয়ালিটির শাড়ী পাঁচ জোড়া আর ঐ কোয়ালিটির ধুতি পাঁচ জোড়া আপনাকে দেবার জন্যে হুকুম দিয়েছেন খোদ কর্তা।

মিষ্টার দত্তের কথার সংগে সংগেই দেখি এক চাপরাসী আলাদা আলাদা মোড়কে বাঁধা দুটো বাণ্ডিল আমার পাশের টেবিলের ওপর রেখে গেল। মিঃ দত্ত মৃদু হেসে বললেন—ঐ দেখুন, এসে গেছে।

অতিমাত্রায় পুলকিত হয়েও অপ্রতিভের মত বলতে হোল : কিন্তু অতগুলো কাপড়ের দাম ত ······

হাসির গমকে অমনি ঘরখানা ভরিয়ে বলে উঠলেন মিঃ দত্ত : ক্ষেপেছেন আপনি! দামের কথা তোলবার মানে? কর্তার মেজাজই আলাদা। এ সব ছোট খাটো ব্যাপারে দাম টামের কোন বালাই নেই। দাম আপনাকে দিতে হবে না, এ হোল প্রেজেণ্ট, বুঝলেন?

বিস্ময়ে থ হয়ে গেলাম! বলে কি? বিস্ময়ের ওপর বিস্ময় আরো বাড়াইয়া দিলেন মিঃ দত্ত পরের ব্যাপারটি শুনিয়ে দিয়ে :

আর দেখুন, কাল পরশুর মধ্যে বস্তা দুই মিহি চাল, দু' ব্যাগ চিনি, এক টিন কেরোসিন, আর গাড়ী খানেক কয়লা আপনার বাড়ীতে গিয়ে

পৌঁছাচ্চে। বাড়ীতে বলে রাখবেন, জায়গা যেন ঠিক থাকে। কোন খরচা আপনার লাগবে না—ফারমের মজুররাই তুলে দিয়ে আসবে।

বাকশক্তি বুঝি কিছুক্ষণের জন্যে হারিয়েই ফেলেছিলাম। এর পর কী বা বলি? যোগ্য উত্তর দিতে হলে হয় ধন্যবাদের সহিত প্রত্যাখ্যান করতে হয়, অন্যথায় মৌনাবলম্বনই শ্রেয়। নিত্যাবশ্যক দ্রব্যজাতের ব্যাপারে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, আজ সকালেও এ-সম্পর্কে বাবা ও মায়ের কাছ থেকে যে অলক্ষ্য আঘাত অন্তরে দাগা দিয়েছে, তাতে এত বড় সুযোগ প্রত্যাখ্যান করবার মত মনোবল আমার মনোরাজ্যের কোথাও সূক্ষ্ম হয়েও ফুটে উঠল না। সুতরাং নীরবে মুখখানা নিচু করে জানিয়ে দিতে হোল—মৌনং সম্মতি লক্ষণম্।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিঃ দত্ত যেন অতি বড় শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ বা একান্ত অন্তরঙ্গ স্থানীয় হয়ে পড়েছিলেন। আমার অবস্থাটা বোধ হয় উপলব্ধিও করেছিলেন। তাই ঠিক এই সময় তাড়াতাড়ি উঠে এসে আমার পিঠটি চাপড়ে বলে উঠলেন—চীয়ার আফ মাই ফ্রেণ্ড, এর জন্যে কোন কুণ্ঠা বা সংকোচ মনে এনো না। আরে ভাই, আমাদের মাথার মগজ দিয়েই ত এত বড় ব্যাপার গড়ে উঠেছে, মালিক সেটা বোঝে, তাই মগজ যাতে ভাল থাকে, সে সব জিনিস খেলাতের মত দিয়ে আমাদের তোয়াজ করে থাকেন। এতে দ্বিধার কিছু নেই। এর দশ গুণ যে তোমার মগজ ভাঙিয়ে উসুল করে নেবে এরা—সেটা ভুলে যাও কেন? যাক, এখন এসো, খোস্ মেজাজে কনট্রাক্টটা সেরে ফেলা যাক।

কনট্রাক্ট পড়েই চক্ষুস্থির! মালিকের ছেলেটিকে পড়াবার কোন প্রসংগই কনট্রাক্টে নেই। সর্ত হয়েছে, অর্থ-নৈতিক উপদেষ্টা রূপে কেবলমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। আর প্রতিষ্ঠানের নামটির উপরে পরিচালকরূপে যে নামটি জ্বল জ্বল

করছে তার জলুসে বুঝি দু চোখের দীপ্তি নিবে এলো। শহরের যে কজন সুবিধাবাদী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আসন্ন অন্ন সমস্যাটা বুঝতে পেরে বাংলার চাষীদের মজুত চাল ধরে রেখে দুর্ভিক্ষের পথটি খুলে দেয় এবং তার পরেই সরকারের সরবরাহদার হয়ে দেদার অর্থ লুটতে থাকে—তাদের মধ্যে সর্বাধিক কুখ্যাত মানুষটির এই নাম না? অমনি যেন স্মৃতিমধ্যে ফুটে উঠলো পাশাপাশি দুটি বুদ্‌ বুদ্‌—চিনিয়ে দিল এক লহমায় দুটি অবাঞ্ছিত অভিশপ্ত কুখ্যাত নাম; তাদের এক জন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হাজিসাহেব, অন্যজন—কার্যাধ্যক্ষ দত্ত সাহেব। আর এমনি দগ্ধাদৃষ্টের বিড়ম্বনা যে, একদা লেখনীর মারাত্মক শর যাদের হীন প্রবৃত্তিকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তাদেরই প্রতিষ্ঠানে এসে জাগ্রত এবং সচেতন অবস্থায় কনট্রাক্ট ফরমে স্বাক্ষর করবার জন্যে কলম উদ্যত করেছি!

শিক্ষাব্রতীর তেজস্বী মন হোল বিদ্রোহী; কিন্তু পরক্ষণেই প্রাপ্তিগত পরিবেশ এবং প্রচুর সম্ভাবনার সঙ্গে বৃত্তির যে অংকটি টাইপ করা হয়েছে, সেটি পড়েই চোখ দুটো যেন কপালের দিকে উঠে গেলো। কলেজে প্রতি মাসে যে টাকা পাই, পরিমাণে তার প্রায় চারগুণ বেশী। এর ওপর আছে বছরে দু'টো বোনাস। মফস্বলের শাখাগুলি পরিদর্শনে গেলে মোটা রকমের এলাউয়েন্স, এসব ছাড়া জীবনযাত্রার নিত্যাবশ্যক বস্তুগুলি একেবারে ফাউ! ইউনিভারসিটির বড় বড় ডিপ্লোমার জলুসভরা কলেজেপড়া শিক্ষিত মনের প্রখর ঝাঁঝটুকুও যেন চুক্তিনামার উপরি পাওনার ফর্দে আবিষ্ট হয়ে কোথায় তলিয়ে গেল।

কলেজ থেকে যে গাড়ীতে আফিসে গিয়েছিলাম, সেই গাড়ীই আমাকে বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে গেল। বাবা তখন বাড়ীর বাইরে গলির গায়ে সরু চাতালটার ওপর বসে তামাক খাচ্ছিলেন। গাড়ী থেকে আমাকে নামতে দেখে তিনি ত চমকে উঠলেনই, তারপর

আমার পিছনে পিছনে বাণ্ডিল দুটী নিয়ে উর্দীপরা চাপরাসীর ওপর নজর পড়তে মুখখানার এক অপূর্ব ভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ালেন। চাতালটার গায়েই বাইরের দিকে ছোট একখানি ঘর আমাদের দিনের• বৈঠকখানা, রাতে বাবার শয়নঘর। ব্যাপারটা আমার মুখে শুনে বাবার মুখের ভঙ্গিটুকু অতি উল্লাসে যেন ফেটে পড়ল! বাণ্ডিল দুটী নিজের হাতে খুলে প্রত্যেক কাপড়খানি টিপে টিপে দেখে কী স্ফূর্তি তাঁর! একা একা আনন্দ উপভোগ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলেন না যেন—চীৎকার করে মাকে ডাকতে লাগলেন। অল্পক্ষণের মধ্যে আমার ভাগ্যোদয়ের সংবাদে বাড়ী ও পাড়া গুলজার হয়ে উঠল।

বিয়ের সময় কটা দিন বাড়ীখানা যেমন আনন্দে হেসে উঠেছিল, এতদিন পরে আজ যেন তারই আভাস পাওয়া গেল। লম্বা একখানা কাগজ নিয়ে মহা উৎসাহে বাবা ফর্দ করতে বসে গেছেন, মা মুখে মুখে বলে যাচ্ছেন কি কি আনতে হবে। ছেলের দৌলতে এত বড় দুর্দিনেও যে এ বাড়ীতে সুখের আলো পড়েছে—সত্যনারায়ণের শিরণী উপলক্ষ করে পাড়ার সকলকে সেটা জানাতেই হবে যে! ঝাঁ করে অমনি মনে পড়ে গেল সকালের কথা—কি আঘাতই পেয়েছিলাম! কিন্তু আঁধারের মাঝে হঠাৎ আলো দেখা দিলে সবই বদলে যায়।

বাড়ীর বৌ'রা সেদিন বিকেলে কি একটা ব্রত উপলক্ষে পাড়ার রায় সায়েবদের বাড়ীতে গিয়েছিল। বন্দনা যখন ঘরে ঢুকলো, তখন আমার খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে—বিছানায় বসে তারই প্রতীক্ষা করছিলাম। কারণ, ভাগ্যোদয়ের ব্যাপারটা আগাগোড়া তাকে শোনাবার জন্যে মনটা উসখুস করছিল। কিন্তু তার মুখখানার ওপর নজর পড়তেই আমার বুকখানা যেন কেঁপে উঠল। এমন তিক্ত মুখ ত কোনদিন দেখিনি। ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করলাম: 'কেমন খাওয়ালে?'

ঝংকার দিয়ে বন্দনা জানালে : 'খাওয়ালে না বিষ গেলালে ?
'আগে জানলে কে যেতো ওখানে !'

একটু বিস্মিত হয়েই জিজ্ঞাসা করলাম : –'কি করেছে ওরা ?'

বন্দনা বললে : 'পাড়ার বুকে বসে দাড়ি ওপড়াচ্ছে আর কি করবে ! আফিস থেকে র‍্যাসন এনে বাড়ীতে চোরাবাজার খুলেছে ।'

কথাটা শুনে যে খুবই বিস্মিত হলাম তা নয়, কেন না আভাসে এটা এর আগেও শুনেছি । রায় সাহেব রেল আফিসের একজন বড় চাকুরে, তাছাড়া তাঁর ছেলেরাও ওখানে চাকরী করে । ফি হপ্তায় নিজেদের রেশম যা আসে সে ত প্রচুর, তার ওপর নানা কৌশলে তাঁর তাঁবেদারদের রেশন কিনে নেন নিজে—তারা হয় ত মেসে থাকে, কিম্বা গ্রাম থেকে আসে । উদ্বৃত্ত জিনিস চড়া দরে বাড়ী থেকে বিক্রী করা হয়—রায় সাহেবের গিন্নীই এই ব্যাপারটা চালান ।

বন্দনাকে বললাম : 'তা তুমি এতে রাগ করছ কেন, এ বাজারে যার সামর্থ আছে, মালপত্র মজুত করছে, কেউ বা বিক্রী করে টাকা জমাচ্ছে ! তা এতে দোষ কি ? –

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চেয়ে বন্দনা বলল : দোষ নেই ? তাহলে তুমি যেসব কথা লিখেছিলে—সেগুলোর কোন দাম-নেই বল ? মুনফার লোভে যারা মজুত করে দুর্ভিক্ষকে ডেকে এনেছে, তোমাদের এই রায় সাহেবও কি সেই জাতের নয় বলতে চাও ? কি বলবো, আগেই খেয়ে মরেছিলুম নৈলে –'

পরের কথাটা বুঝি বন্দনার গলায় বেধে গেল, বুঝলাম সত্যই সে রীতিমত বেদনা পেয়েছে ওদের এই অনাচারে । ব্যাপারটা বুঝেও তবু জিজ্ঞাসা করলাম : 'খাওয়া দাওয়ার পরে কি হোল শুনি ?

মুখখানা বিকৃত করে বন্দনা বলল : 'গিন্নী সবার সামনে জাঁক করে জানাতে বসলেন : যে সব জিনিষের জন্যে লোকে মাথা কুটে মরছে, তাঁর

কর্তা আর ছেলেদের দৌলতে সে সব জিনিষে তাঁর বাড়ী কেমন করে উপ্‌চে পড়ছে! আর লোকের কষ্ট দেখে চুপ করে থাকা ত ওঁদের অভ্যাস নয়, তাই যা বাঁচে প্রাণ খুলেই বিলিয়ে দেন।

জিজ্ঞাসা করলাম: 'খয়রাৎ করেন নাকি?'

বন্দনা বলল: 'ক্ষেপেছ, তারপরেই ত দাম জানিয়ে দিলেন—কোন্‌টির জন্যে কি নেন; তোমায় বলব কি—হুবহু চোরাবাজারের গলাকাটা দর—আর এই নিয়ে ওঁদের আধিখ্যেতা কত!"

রায় সাহেবের বাড়ীর ব্যাপারে বন্দনার মনোবৃত্তি আমার মনটিকেও বেশ দমিয়ে দিলে বৈকি! আমার ভাগ্যোদয়ের ব্যাপার তবে এখনো সে মায়ের কাছে নিশ্চয়ই শোনেনি, কিন্তু শোনবার পর কি ভাবে সে নেবে কে জানে! যাই হোক, সরাসরি কথাটা না পেড়ে একটু ঘুরিয়ে বললাম: 'তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ আছে বন্দনা, কোন একটা মার্চেণ্ট আফিস থেকে চাকরীর এক অফার এসেছে, খুব একটা মোটা মাইনে—কলেজে যা পাই তার প্রায় চারগুণ বেশী, তা ছাড়া…'

কথাটায় বাধা দিয়ে বন্দনা বলল: 'উপরি পাওনা গণ্ডাও আছে—এই ত? দেখ, আমরা যখন পশ্চিমে ছিলুম, সেখানে আবগারীর এক হোমড়া চোমড়া লোকের সঙ্গে বাবার ভারি ভাব হয়েছিল, তিনি বাবাকে বলেন, 'ইস্কুল মাষ্টারী করে কত টাকাই বা উপায় করেন, আমার কথা শুনুন মশাই, গোটা কয়েক আবগারী দোকান বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, লোকজন সব করবে, আপনি শুধু গদীর ওপর বসে থাকবেন—তাতে মাস গেলে হাজার টাকা আপনার ঘরে আসবে। শুনে বাবা কি জবাব দিয়েছিলেন তাঁকে, শুনতে চাও? বাবা বলেছিলেন, 'মা সরস্বতীর আস্তানা ছেড়ে সেতখানায় আমাকে সেঁধুতে বলছেন পয়সা কামাবার

জন্তে ?'···এই পর্য্যন্ত বলেই বন্দনা আমার প্রস্তাবটাকে যেন নস্যাৎ করেই হঠাৎ আলোটি নিবিয়ে দিয়ে বললে ঃ 'ঘুমাও অনেক রাত হয়েছে।'

বন্দনা ঘুমিয়েছিল কি না জানি না, জানবার চেষ্টাও করিনি। এর পর এই প্রসঙ্গ নিয়ে তার সঙ্গে যে আলাপ জমতে পারে না, সেটা বুঝেই নীরবে ঘুমাবার ভাণ করেই পড়ে থাকতে হোল ; চোখের ওপর ভাসতে লাগল—নূতন কর্মক্ষেত্র, প্রাপ্তিযোগের নানা পর্যায়····সেই সঙ্গে বন্দনার বিচিত্র মুখভঙ্গি !

ডায়েরীর পরবর্তী বয়ানগুলি ক্রমশঃ হ্রস্ব ও সংক্ষিপ্ত হইয়াছে। প্রতিদিনের লেখা এক নজরে পড়িয়া চলিল অজয়। দিনের পর দিনের বৃত্তান্তগুলির মর্মাংশ এইরূপ ঃ পরদিন সকালেই কাজের অছিলায় বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়া গেল। কতকগুলি দরকারী জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে এত সন্তর্পণে সংকল্পটি সারতে হোল—কোন রকমে যাতে বন্দনার সঙ্গে চোখোচোখি না হয়ে যায়। তার মুখের পানে তাকিয়ে চোখের সংগে দৃষ্টি মেলাবার সাহসটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছি। আফিসে এসে দত্ত-সাহেবকে ব্যাপারটি সব খুলে বলে এ অবস্থায় চাইলাম তাঁর যুক্তি। পাকালোক, হিসিবি মাথা, সুযুক্তিই পাবো ভাবা গেল।

তিনি মিনিট খানেক চুপ করে থেকেই সহর্ষে খপ করে বললেন : "কুচ পরোয়া নেই, আমি সব ঠিক ঠাক করে দিচ্ছি। আপনি এই সূত্রে মফস্বলেই বেরিয়ে পড়ুন। আপনার বাড়ীতে এখনি ত রেশনপত্র সব যাবে, আপনি সেই সঙ্গে একখানা চিঠি লিখে জানিয়ে দিন যে আফিসের কাজে বাইরে চলেছেন, ফিরতে দেরী হতে পারে—আফিস সব ব্যবস্থা করবে।'

বাংলার নানা অঞ্চলেই এঁদের বড় বড় শাখা। জেলার কর্তারা যে রকম আড়ম্বরে মফস্বলে পরিদর্শনে যান, আমার সম্বন্ধেও ব্যবস্থা তেমনি উঁচুদরের হোল। চাপরাসী, সহকারী, বরকন্দাজ সংগে চললো। দেখলাম, টাকা নিয়ে যেন ছিনি-মিনি খেলা চলেছে। টাকা উপায়ের কতকগুলো ফন্দিও চুপি চুপি আমাকে বলে দিয়েছিলেন দত্ত সাহেব। সেগুলো কাজে লাগিয়ে আমিও যেন আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়ে উঠি, এই আর কি! আমিও সমগ্র মনটি এদিকেই নিবিষ্ট করলাম। কোথায় রইল বন্দনা, আর—কলকাতার ঘর, সংসার, পরিজন, কলেজের পরিচিত বন্ধুবান্ধবের দল। টাকা—টাকা—প্রতিষ্ঠানের ভাঁড়ার ভরিয়ে উপচে পড়ে আমাকেও যেন অস্থির করে তুলেছে! চলতি প্রবাদ পুরোপুরি ফলে গেছে আমার বরাতে—ঈশ্বর যখন দেন, ছপ্পর ফুঁড়েই দেন।

বাড়ী থেকে চিঠি আসে প্রায়ই, লেফাফা দেখে বুঝতে পারি যে বাবা লিখেছেন। মামুলী কথা, একই ধরণের—'আফিস থেকে ঠিক মত সব জিনিসই আসছে, তোমার কল্যাণে মা-লক্ষ্মী আঁচল মেলে সংসার জুড়ে বসেছেন। সবই ভালো, সবার মুখেই হাসি, কিন্তু ছোট বউমাই কেবল অসুখী, ওঁর নাকি এ সব ভাল লাগে না। তুমি তাঁকে বুঝিয়ে লিখো যে এরকম মন-মরা হয়ে থাকা আর যখন-তখন নিশ্বেস ফেলা ভাল নয়। বাবার প্রতি পত্রেই থাকে এমনি নালিশ। অতিষ্ঠ হয়ে বন্দনাকে লিখলাম এক পত্র, নালিশগুলো জানিয়ে চাইলাম কৈফিয়ৎ। হয়ত এখানে চিঠিখানা না লিখলেই ভাল করতাম। দিন চারেক পরেই বন্দনার কাছ থেকে এল তার উত্তর। সে লিখেছে—'বাবার পত্রে তুমি যা জেনেছ, তার প্রতিবাদ করব না। কিন্তু তোমার যুক্তি আমার অন্তর স্পর্শ করল না। কারণ, তোমার বৃত্তিকে স্বীকার করা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, আমার মতে তুমি চলেছ পাপের পথে। আর এ পাপ শুধু আমাকে নয়

আমাদের সন্তানেও বর্তাবে। তাই তোমার পাপ মুক্তির জন্যে তপস্যাই হবে আমার সাধনা।' চিঠিখানা পড়ে হেসে উড়িয়ে দিতে গেলুম, কিন্তু মনটা সত্যিই যেন দমে গেল।

মাসের পর মাস কেটে যায়, কলকাতায় ফেরা হয় না আর। আফিসের কর্তারা আমার কাজে খুব খুশি। আমিও এখন ওপর-ওয়ালাকে খুশি করে কাজ বাগাতে পাকাপোক্ত হয়ে পড়েছি। পূর্বের ধারণাগুলো ক্রমশ মন থেকে সরে যাচ্ছে, যে সব ব্যাপারের নামেই মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত, এখন শ্রদ্ধার সংগে সেগুলির সমর্থন করি—মনগড়া যুক্তি রচে উপরওয়ালাদের তাক লাগিয়ে দিই। এখন বুঝতে পারি—এঁরা অত তোয়াজ করে আমাকে এঁদের প্রতিষ্ঠানে ভিড়িয়েছিলেন কেন? এঁরা কি জানতেন যে. প্রথমে যে ঘোড়া খুব বেশী তড়ফায়, দানাপানি আর তোয়াজে তাকে তত বেশী টিট করা যায়? হঠাৎ বাবার পত্র পেলাম, বন্দনা এখানকার সংশ্রব কাটিয়ে এক কাপড়ে বাপের বাড়ী চলে গেছে—এ বাড়ীর অন্নজলে তার আর রুচি নেই।

পরদিনই কলকাতায় চলে এলাম। বন্দনা নেই, কাজেই লজ্জা সংকোচের বালাই যেন কেটে গেছে। বাড়ীতে কত কথাই শুনলাম তার বিরুদ্ধে। আফিস থেকে যখন বস্তা বস্তা চাল আসে, সেই সংগে চিনি, কেরোসিন, কয়লা, কাপড়—প্রত্যেক বস্তুর আমদানী দেখে পাড়ার লোকেরা যখন অবাক হয়ে যায়, বন্দনা নাকি সে সময় ঘরের ভিতরে আঁচলে মুখ চেপে কাঁদতে বসে। বলে, 'লোকে কত ধর্ণা দিয়ে যে সব জিনিস পাচ্ছে না, আমাদের বাড়ীতে তার মইমাড়ন চলেছে, এত বড় অন্যায় ধর্মে সইবে না।' এমনি কত কথা। শুনে মনটা দুলে উঠলেও দু হাতে বুক চেপে নবীন উদ্যমে কাজে লেগে পড়ি। মাস ছয়েকের মধ্যে আশে পাশের বাড়ীগুলো কিনে ফেলি, হাল ফ্যাসানের নূতন ইমারত

গড়ে ওঠে; পাড়ার সকলে অবাক হয়ে যায়। অত নামী যে রায় সাহেব, তিনিও যেন অজয় ভট্টাচার্যের ভাগ্যের জোয়ারে তলিয়ে যান!

মাসের পর মাস কাটে, অর্থভাগ্যও সংগে সংগে স্ফীত হতে থাকে। বন্দনা কি খবর রাখে না? কি ভাবে তার দিন কাটছে কে জানে! তার বাবার ত সামান্য আয়, অথচ ব্যয় এখন পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে—কি করে সংসার চালাচ্ছেন তিনি?

ভেবেছিলাম, যুদ্ধ মিটে গেলে উপার্জ্জনেও ভাঁটা পড়বে—প্রতিষ্ঠান উঠে যাবে। তাই ভগবানের কথা উঠলেই এই প্রার্থনাটাই জানাতাম যে—এ যুদ্ধের যেন শেষ না হয়—অনন্তকাল ধরে চলে। কিন্তু প্রার্থনাটি তিনি না রাখলেও উপার্জ্জনে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি তাঁর প্রসাদে। যুদ্ধের পর সরকারের ব্যবস্থায় অন্নবস্ত্র সরবরাহের যে সব সরকারী ও বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান খোলা হয়েছে, টাকার জোরে আর সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানটির সংগে যোগ-সাজসে তার অনেকগুলিই স্বনামে ও বেনামে আয়ত্ত করে ফেলা গেছে। ফলে, বুদ্ধি চালনা করে আর্থিক উন্নতির আর এক নবতম অধ্যায়ে প্রবেশ সম্ভব হয়েছে। বরাদ্দ মত গাট গাট কাপড় আসে; আকুল দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করে শহরের চাতক চাতকীরা—লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে উদয়াস্তকাল, কিন্তু তাদের অদৃষ্টে কতটুকুই বা বর্ষণ হয়! আমাদের মত সুবিধাবাদী সঞ্চয়ীদের দারুণ পিপাসা মেটাতে বেশী অংশটাই যে চোরা বাজারে গিয়ে শুকিয়ে যায়।

এইখানেই অজয়ের ডায়েরী শেষ হইয়াছে। ইহার পরের পাতাগুলিতে কালি কলমের কোন নিদর্শনই নাই। এই পর্যন্ত পড়িয়াই অজয় ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে কি ভাবিল, তাহার পর পকেট হইতে পার্কার পেনটা হাতে লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিল:

প্রায় তিন মাস আর ডায়েরী লেখা হয়নি, কাজের ভীড়ে ফুরসদ মেলেনি। সরকার ত কাজ বাড়িয়ে দিয়েছেনই, প্রত্যেক লোকের রেশন কার্ড তদারক করে নম্বর মিলিয়ে তবে কাপড় দেবে, ক্যাস মেমোয় সে নম্বর লিখতে হবে। এ ছাড়া আমাদের আরো এক কাজ আছে—কাপড়ের গাঁট এলেই ভালো ভালো কাপড়গুলো বেছে আলাদা করে চোরাবাজারের জন্যে ঠিক করা ; তার পর আগেকার লুকানো পুরাণো বস্তাপচা মালগুলো এই সুযোগে নূতন আমদানীর মালের জায়গায় দিয়ে চালিয়ে দেওয়া—এ সব বড় সোজা কাজ নাকি ? তার পর, যাদের জন্যে আমরা এত হাঙ্গামা সহ্য করি, তাদের আবার নালিশ আছে, তদারক আছে। সেদিন এমনি একটি নালিশের সম্পর্কেই ত কেঁচে খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। রেশন কার্ড নিয়ে পুরো তিনটি মাস ঘোরাঘুরি করেও এক ফর্দ কাপড় পাননি জানিয়ে ওপরওয়ালার কাছে দরখাস্ত করেছেন এক ভদ্রমহিলা। খোদ কর্তা সে দরখাস্ত পড়ে একেবারে আগুন আর কি! কড়া চিঠিতে জানিয়ে দিলেন, ব্যাপারটা তিনি নিজে তদারক করবেন, যদি দেখেন নালিশ সত্যি, তাহলে আমানত জমার টাকা ত জব্দ হবেই, তাছাড়া আমাদের স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তিও সরকার বাজেয়াপ্ত করবেন, তাঁর ওপর জেল খাটিয়ে তবে ছাড়বেন। আশ্চর্য্য হলাম। ভাবলাম, ভাগ্যের জোয়ারে কি ভাঁটার টান পড়েছে? বড় বড় মহাসাগর হেলায় পার হয়ে শেষে কি গোষ্পদের জলে ডুবে মরবার জো হয়েছে! হঠাৎ মনে পড়ে গেলো—বছর কয়েক আগে অনাচারী কারবারীদের দমন করবার জন্যে ঠিক এমনি ব্যবস্থাই আমার কলম থেকেই বেরিয়েছিল। তবে কি সে চাকা কেউ ঘুরিয়ে দিলে নাকি ? নিজেই গেলাম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি এক নজরে আমাকে দেখে নিয়ে নীরবে দরখাস্তের ফাইলটি আমার হাতে

দিলেন। এক নিশ্বাসে ফাইলটি পড়েই আমার মাথা যেন ঘুরে গেল, চোখের সামনে সব কিছুই যেন ঝাপসা হয়ে এল, দরখাস্তের নিচে ইংরাজী অক্ষরে লেখা রয়েছে—শ্রীমতী বন্দনা ভট্টাচার্য,...নং নারিকেলডাঙ্গা রোড, কলিকাতা।

সন্দেহ করবার কিছুই নেই। পরিচিত নাম, পরিচিত হস্তাক্ষর, পরিচিত ঠিকানা। সমস্ত অন্তর যেন মথিত করে একটা কথা ভেসে উঠলো—কনট্রোলের দোকানে দিনের পর দিন চেষ্টা করেও যে ভদ্র-মহিলাটি পরণের একখানি শাড়ীও যোগাড় করতে না পেরে এই দরখাস্ত করেছে—সে আমার স্ত্রী, আর কেউ না, আমারই স্ত্রী! বুঝতে আর কষ্ট হলনা যে, ঐ অঞ্চলের যে রেশন সপটির সম্পর্কে এই নালিশ, তার কর্মকর্তা আমারই কোন নির্বাচিত ব্যক্তি হলেও সরকারী সেরেস্তার মালিক রূপে আমার নামটাই পাকাপোক্ত হয়ে আছে।

মুখখানা গম্ভীর করে সাহেব বললেন: তুমি যে গভীর জলের মাছ, আর মুনফা খেয়ে রীতিমত মুটিয়ে উঠেছ, সে খবর আমি পেয়েছি। এই কেস যদি প্রুফ হয়ে যায়, আমি তোমাকে রাস্তার ভিখিরী করে তবে ছাড়বো।

আত্মসমর্থনে কি বলতে গেলাম, কিন্তু সাহেব বাধা দিয়ে বললেন: তোমার যা বলবার আছে তদন্তের দিন শুনবো, আজ শুধু তোমার চেহারাখানা দেখবার আর দরখাস্তখানা দেখাবার জন্যে তোমাকে ডেকেছিলাম, এখন তুমি যেতে পারো।

এত বড় আঘাত বুঝি জীবনে কোন দিন পাইনি। তখনি মিঃ দত্তের সংগে দেখা করে ব্যাপারটা আগাগোড়া বললাম। তিনি শুনেই লাফিয়ে উঠে বললেন: 'আরে, আগে আমাকে বলতে হয়, এখনি আমি ব্যবস্থা করছি, আর এই সূত্রে তোমাদের বিচ্ছিন্ন দুটি মনে মিলন-গ্রন্থি বেঁধে দিচ্ছি হে!'

বিশ্বস্ত একজন লোক দিয়ে সেই দিনই বাছা বাছা কতকগুলি শাড়ী ও ধুতির একটা বাণ্ডিল বন্দনার বরাবর পাঠানো হল। ঘণ্টা দুই পরেই বাণ্ডিলটি অবিকল ফেরৎ এলো, তার সংগে ছোট একখানি চিঠি। বন্দনা সে চিঠিতে লিখেছে :

"থান কয়েক কাপড়ের মোহে স্বহস্তে নিজের অম্লান বৃত্তিটিকে হত্যা করে সাহস তোমার বেড়ে গেছে বলেই আজ আমাকে সেই পথে ভেড়াতে চেয়েছ। তোমার সেই প্রথম পদস্খলনের দিনটির সংগে সেদিনের উপরি পাওনা যে কয় জোড়া কাপড় জড়িয়েছিল, তাদের ভিতর থেকে একটি জোড়া শাড়ী মা আমাকে দিয়েছিলেন। সে জোড়াটি আমার ভাগেই পড়েছিল। আমাদের শোবার ঘরে তোরঙ্গের ভিতরে সে কাপড় জোড়াটি তোলাই আছে। সেদিন খুবই ইচ্ছা হয়েছিল সেই কাপড় গলায় বেঁধে ঝুলে পড়ে তোমাকে ও-পথ থেকে ফেরাতে কিন্তু আত্মঘাতীর মুক্তি নেই জেনে নিরস্ত হয়েছিলাম। তোমার আজকের বাণ্ডিল ফেরৎ পাঠাচ্ছি। আর, এই প্রসঙ্গে একথাও জানাচ্ছি যে, যোগ্য দাবী নিয়ে কন্ট্রোলের দোকানে কাপড়ের জন্যে দাঁড়াতে তত লজ্জা নেই—যত লজ্জা দেশের লোককে বঞ্চিত করে সঞ্চিত বস্ত্রে প্রিয়জনের লজ্জাকে ঢাকতে যাওয়া। দেশের মেয়েরাও আজ জাগ্রত হয়েছে—দেশে বইছে এখন যুগের হাওয়া। এ হচ্ছে তারই চুক্তিনামা—আমরা যে এখন যুগের যাত্রী।"

এর পর আর কি করতে পারি? যাকেই জিজ্ঞাসা করব, সেই স্বার্থের দিকে চেয়ে এক একটা মনগড়া যুক্তি দেবে। তাই, সব রাস্তা বন্ধ করে এই ঘরে এসে বসেছি। তাই, অতীতের স্মৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয় করছি। ঈশ্বর আমার মনে বল দিন। মুক্তি নেই জেনে বন্দনা আত্মহত্যা করেনি, আমিও আত্মঘাতী হব না। কিন্তু আত্মদান করবার

অধিকার ত আমার আছে। তাই, সর্বাগ্রে এই ডায়েরীর পাতায় কালজয়ী অক্ষরে আমি আমার সংকল্প আজ ফুটিয়ে তুলছি :

দেশ ও জাতিকে বঞ্চিত করে যে প্রচুর সম্পত্তি আমি অর্জন করেছি—কেবল মাত্র বসতবাড়ী খানা ছাড়া—সে সমস্তই আমার দেশবাসীর জন্যে উৎসর্গ করছি। আমি আবার কলেজে চাকরী নিয়ে নতুন জীবন শুরু করবো। দেশের প্রতি অনাচারের যে শাস্তির নির্দেশ একদিন আমার কলম দিয়ে বেরিয়েছিল, সেই শাস্তি আজ নিজেই বহন করছি। এর পরও কি বন্দনা আমাকে মার্জনা করবে না ?

দুই
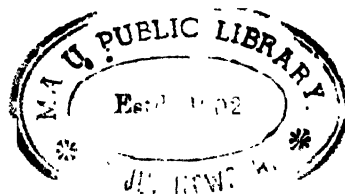
পার্ক ষ্ট্রীটে ম্যাডাম মেরিনার জুয়েলারী-সপটি যুদ্ধের বাজারে খুবই জমকাইয়া উঠে। একে ত প্রতিষ্ঠানটির সুনাম আছে, উপরন্ত ম্যাডামের তরুণী রূপসী কন্যা সোফিয়ার যোগদানের পর দোকানখানির বেচা-কেনা আশ্চর্য রকম বাড়িয়া গিয়াছে। মেয়েটির সুন্দর মুখ, মিষ্টি হাসিয়া কথা বলিবার ভঙ্গি, মধুর ব্যবহার একশ্রেণীর অভিজাত ক্রেতাকে এমনই আকৃষ্ট করিয়াছে যে, প্রয়োজন না থাকিলেও কোন না কোন সামগ্রী কিনিবার বা পছন্দ করিবার অছিলায় প্রায়ই তাহারা দোকানে দর্শন দেয়; ফলে, ধনকুবেরদের সমাগমে শো-রুম যেন হাসিতে থাকে। ম্যাডাম মেরিনার ইহাতে খুবই আনন্দ।

সেদিন, বাহিরের শো-রুমটির ঠিক পিছনে ক্ষুদ্র ষ্ট্রং-রুমটির চার্জ ছিল সোফিয়ার উপরে। রেলিংয়ের আকারে ঘেরা অপরিসর লম্বা টেবিলটির সামনে উঁচু চেয়ারে বসিয়া সোফিয়া দামী জুয়েলারীগুলির তালিকা করিতেছিল। কোন বিশিষ্ট গ্রাহক দোকানে আসিয়া অসাধারণ গহনাপত্র কিছু দেখিতে চাহিলে এই ঘরে তাহাকে আনা হয়; আর এই ঘরের চার্জ যাহার উপর থাকে, চাহিদার জিনিস সম্বন্ধে যাহা কিছু বিলি-ব্যবস্থা সে-ই সব করে।

এইমাত্র দোকান খুলিয়াছে; ঘড়িতে তখনো সাড়ে-দশটা বাজে নাই। সোফিয়ার মামা জোসেফ করে শো-রুমের তদারক। তাড়াতাড়ি সে ষ্ট্রং-রুমে আসিয়া সোফিয়াকে বলিল: এক জাঁদরেল খদ্দের এসেছে সোফি, খুব দামী এক ছড়া মুক্তোর মালা চায়—যার জোড়া নেই

বাজারে। দিদি বললে, সে জিনিস আছে আমাদের ষ্টকে। ওকে গাঁথা কিন্তু চাইই, ভারি খরচে লোক; আমাদের ফারমে এই প্রথম এসেছে।

সোফিয়ার মুখখানা অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল মামার কথাগুলি শুনিয়া, কাঠিন্যের একটা ছাপও পড়িল মুখের ভঙ্গিতে। যদিও তাহাকে শহরের বিলাসী ধনীসম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করিতে হয় পেটের দায়ে, কিন্তু বড়লোকদের উপর সে প্রসন্ন নয় মোটেই। জোর করিয়া মুখে হাসি টানিয়া যখন সে ইহাদের তোয়াজ করে, তার মনের ভিতর যেন বিষের আঙরা জ্বলিতে থাকে। তাই মামার কথা শেষ হইলে মুখখানা বাঁকাইয়া সে প্রশ্ন করিল: আমাদের দোকানে পদার্পণ করেনি— এমন বড়লোকটি কে শুনি?

মুখখানা উঁচু করিয়া জোসেফ বলিল: হ্যাঁ, হ্যাঁ, নামটা তোমার শুনে রাখা উচিত বটে! ইনি হচ্ছেন প্রিন্স নন্দলাল, এঁর নাম সবাই জানে, ধুলোর মতন টাকা ছড়িয়ে খুব নাম কিনেছে লোকটা। যাই হোক, মালাছড়াটা এঁকে গছানো চাইই।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলিয়াই জোসেফ চলিয়া গেল। আগন্তুক মক্কেলটির নাম শুনিয়াই সোফিয়ার মুখের ভাব একেবারে বদলাইয়া গেল!...আশ্চর্য্য, যে খেয়ালী মানুষটির সম্বন্ধে বহু গল্পই সে শুনিয়াছে, অথচ কোনদিন চাক্ষুস পরিচয়ের সুযোগ ঘটে নাই, চারিত্রিক নিন্দা যাঁর প্রচুর, অথচ দানের ব্যাপারে যিনি এ-যুগের দাতাকর্ণ বিশেষ; সেই বহু-নিন্দিত ও বহু-প্রশংসিত মানুষটিকে দেখিবার এবং কোন একটা অপ্রীতিকর বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া কৈফিয়ৎ চাহিবার কি আগ্রহই সে মনে মনে পোষণ করিয়া আসিতেছে কয়েকটি সপ্তাহ ধরিয়া! কিন্তু যেমন তাহার সুযোগ উপস্থিত হয় নাই, তেমনই মনের সংকল্পটিকে

সার্থক করিবার মত সাহসও সঞ্চয় করিতে পারে নাই। অথচ, সেই মানুষটিই আসিতেছে অপ্রত্যাশিতভাবে তাহার কাছে, আর—মনের সমস্ত ক্ষোভ ও দ্বন্দ্ব সবলে চাপিয়া রাখিয়া হাসিমুখেই মনোরঞ্জন করিতে হইবে তাহার!......

চিন্তার সুতা ছিঁড়িয়া গেল স্প্রিং লাগানো দ্বারটি খোলার শব্দে। সোফিয়া দেখিল তাহার মা মেরিনা এমন এক প্রিয়দর্শন পুরুষকে লইয়া ড্রইং-রুমে প্রবেশ করিতেছেন—হাজার লোকের মধ্যে যাহার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যটুকু আপনি প্রকাশ করিয়া দেয়।

আগন্তুক প্রিন্সের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও প্রয়োজন কন্যাকে জানাইয়া ম্যাডাম মেরিনা চলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে দরজাটি আপনি বন্ধ হইয়া গেল।

সোফিয়া এতক্ষণ মুখখানা নিচু করিয়াই ছিল। এখন চোখ দুটি তুলিতেই তাহার মনে হইল—আগন্তুকের এক অদ্ভুত দৃষ্টি তাহার মুখের উপর পড়িয়া যেন চুম্বকের মত আকর্ষণ করিতেছে তাহাকে—এত দীপ্ত ও প্রখর সে দৃষ্টি যে, অভিভূত না হইয়া পারা যায় না। অজগরের যে দুরতিক্রম্য দৃষ্টির কথা প্রাণীতত্ত্বের নানা গ্রন্থে বর্ণিত আছে—বনের নিরীহ মৃগকুল যাহার সম্মুখীন হইবামাত্র বিহ্বল হইয়া পড়ে, এ-দৃষ্টিও বুঝি তেমনই মারাত্মক, তেমনই আকর্ষক, তেমনই সাংঘাতিক। নিজের অভিভূত অবস্থাটুকু সবলে কাটাইয়া চেয়ারখানি ছাড়িয়া সোজা হইয়া সোফিয়া যেই দাঁড়াইয়াছে, অমনি প্রিন্স সামনের উঁচু টেবিলখানির ও-পাশ হইতে ঝুঁকিয়া 'সেক্‌হ্যাণ্ডে'র এক বিশেষ ভঙ্গিতে তাহার দক্ষিণ করপল্লবটি চাপিয়া বলিল: গুড মর্নিং মিস!

সোফিয়ার মনে হইল যেন বিজলীর ঝাঁকুনি খাইয়া তাহার ডান হাতখানি অবশ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণে সমস্ত সংবিত আকৃষ্ট হাত-

খানার উপরে প্রয়োগ করিয়া এক ঝটকায় টানিয়া লয় এবং সাদর সম্ভাষণের কোন উত্তর না দিয়াই রুক্ষ স্বরে প্রশ্ন করে : কি চাই আপনার স্যর ?

সোফিয়ার এরূপ শিষ্টাচার বর্জিত আচরণে কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ না হইয়া এবং প্রশ্নের উত্তর না দিয়া প্রিন্স বলিল : হাতে লাগে নি ত মিস ? করপল্লবটি যেন ঠিক পদ্মফুলের মৃণাল ; তেমনি নরম, তেমনি সুন্দর ! নিশ্চয়ই খুব রেগে গেছ আমার উপরে নয় ? কি নাম তোমার মিস্ ?

লোকটির আচরণে সোফিয়া অবাক হইয়া ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল তাহার পানে ভাবার্দ্র দৃষ্টিতে। একটু পরে তাহার অজ্ঞাতেই যেন আস্তে আস্তে কণ্ঠস্বর বাহির হইয়া পড়িল : আমার নাম সোফিয়া।

সুন্দর মুখখানার এক বিচিত্র ভঙ্গি করিয়া প্রিন্স বলিল : ভারি সুন্দর নাম ত ! যেমন চমৎকার চেহারা তোমার, পদ্মের পাপড়ির মতন আঙ্গুলগুলি যেমন নরম, গলার স্বরট যেমন মিষ্টি, নামটিও তেমনি !

সংকোচ কাটাইয়া এবং মনে মনে কি একটা অভিসন্ধি আঁটিয়া সোফিয়া শ্লেষের সুরে বলিল : কিন্তু অন্তরটি যদি দেখতে পেতেন তাহলে নিশ্চয়ই বলতেন—অল দ্যাট গ্লিটার্স ইজ নট গোল্ড ! চক চক করলেই সোনা হয়না !

হাসি মুখে প্রত্যেক শব্দটির উপর জোর দিয়া প্রিন্স বলিল : কিন্তু তোমার সম্বন্ধে এ কথা খাটে না মিস্, তোমার স্বচ্ছ দুটি চোখের ভিতর দিয়েই তোমার অন্তরটি আমি এক নজরে দেখে নিয়েছি তা বুঝি জানো না ?

সোফিয়া : তাহলে বলুন ত, কি দেখেছেন ?

প্রিন্স : ফুলের মতন শুদ্ধ আর স্নিগ্ধ এমন একটি হৃদয়—সত্যই যার তুলনা নেই।

সোফিয়া : কিন্তু আপনি যে ভুলে যাচ্ছেন প্রিন্স, মেয়েদের হৃদয় যাচাই করবার কোন ব্যবস্থাই এখানে নেই, এটা হচ্ছে জুয়েলারীর দোকান।

প্রিন্স : জুয়েলারীর দোকান বলেই ত জীবন্ত জুয়েলটিকে খুঁজে পেয়েছি এখানে।

সোফিয়া : তাহলে সত্য করে বলুন ত, আপনি কার সন্ধানে এ-দোকানে দয়া করে এসেছেন ?

প্রিন্স : সত্যিই বলছি মিস্, রত্নের সন্ধানেই সেঁধিয়েছিলাম এই দোকানে। বিশখানা দোকান ঘুরেও ঠিক মনের মতন বস্তুটি পাইনি কিনা ! এখানে শো-রুমে ঢুকে সেটির সন্ধান করতেই একটি মহিলা জানালেন—আছে। ড্রইং-রুমে একে নিয়ে যাও সোফিয়ার কাছে, সেই দেখাবে। নামটি শুনেই মনটি খুশিতে ভরে যায় ; তারপর এ-ঘরে ঢুকেই নামের অধিকারিণীকে দেখেই মনে আশা হোল—বস্তুটি নিশ্চয়ই এখানে মিলবে। সেই আশাতেই আনন্দে তোমার এই সুন্দর করপল্লবটি ধরতে হাত বাড়িয়েছিলুম।

শেষের কয়টি কথার সঙ্গে সঙ্গেই প্রিন্স হাত বাড়াইয়া পুনরায় সোফিয়ার দক্ষিণ প্রকোষ্ঠটি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া আস্তে আস্তে চাপ দিতে লাগিল।

এবার সোফিয়া পূর্বের মত রাগিয়া হাতখানা সবলে টানিয়া লইল না, ডাগর ডাগর দুটি চক্ষু পুরাপুরি মেলিয়া প্রিন্সের দিকে চাহিয়া হাসিমুখে বলিল : হাতখানি তাহলে ছাড়ুন দয়া করে, আপনার চাহিদার বস্তুটি এই হাতেই আপনার সামনে এনে ধরি।—বলিতে বলিতেই সে ধীরে ধীরে প্রিন্সের হাত হইতে নিজের হাতখানি ছাড়াইয়া লইয়া অপাঙ্গে একটিবার চাহিয়াই বলিল : একছড়া মুক্তোর মালা চাই ত ? এক মিনিট অপেক্ষা করুন, নিয়ে আসছি।

ছোট ঘরখানির দেওয়ালের সঙ্গে লাগানো লোহার আলমারিটি খুলিয়া হাতীর দাঁতে নির্মিত কারুকার্য-খচিত ডিম্বাকৃতি আধারটি আনিয়া সে প্রিন্সের হাতে দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল : দেখুন ত খুলে, ভিতরের বস্তুটি ঠিক আপনার মনে ধরে কিনা ! এই একটিমাত্র জিনিস আমাদের ষ্টকে আছে, সারা শহরের জুয়েলারী দোকানগুলো ঘুরলেও যার জোড়া মিলবে না ।

আধারটি খুলিতেই সোনার সূতায় গাঁথা বড় বড় আকারের একশত একটি মুক্তার মালাছড়াটি বাহির হইয়া পড়িল । দেখিবামাত্র প্রিন্সের মুখখানা আনন্দে দীপ্ত হইয়া উঠিল ; সোফিয়ার মুখের দিকে চাহিয়া সহাস্যে বলিল : চমৎকার ! এখানে আসবামাত্র তোমাকে দেখেই আমার মনে হয়েছিল মিস্—যে জিনিসটি আমি খুঁজছি, এই ঘরেই মিলবে । আমি ঠিক এই রকম এক ছড়া মালাই খুঁজছিলুম ।

মৃদু হাসিয়া সোফিয়া বলিল : তাহলে আমার হাত-যশ আছে বলুন !

মুখের কথায় জোর দিয়া প্রিন্স উত্তর করিল : ও-ইয়েস ! তোমার হাতে উঠেই ত এর জলুস বেড়ে গেছে মিস্ !

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সোফিয়া বলিল : বস্তুর দাম কিন্তু বাড়েনি প্রিন্স ! আশা করি, চড়া দরটা অপছন্দের উপলক্ষ হবে না ।

দৃঢ় স্বরে প্রিন্স উত্তর করিল : নিশ্চয়ই নয় ; আমার মটো হচ্ছে—'নাউ' অর 'নেভার'—চোখে যা ধরে, তার জন্যে দরে আটকায় না—তাকে তখনি পাওয়া চাইই । আর চোখে না ধরলে যত সস্তাই হোক না কেন—নেভার, নেভার । এর স্লিপে ত স্পষ্টই দাম লেখা রয়েছে পাঁচ হাজার টাকা, কিন্তু যদি এর আগে আর একটা দাঁড়ি কেউ বসিয়ে দিত, তাহলেও কথা কইতুম না

বিস্ময়ের সুরে সোফিয়া জিজ্ঞাসা করিল : পনেরো হাজার টাকাতেই কিনতেন ? জিজ্ঞাসাও করতেন না—এত দাম কেন ?

গম্ভীর হইয়া প্রিন্স জানাইল : আমার স্বভাবটাই যে এই রকম মিস্—বলিয়াই পকেট হইতে চেক বহিখানা বাহির করিয়া পাঁচহাজার টাকার একখানি চেক লিখিয়া সোফিয়ার হাতে দিল।

স্মিতমুখে সোফিয়া বলিল : থ্যাঙ্কস্!

মালাছড়াটি নাড়িতে নাড়িতে প্রিন্স সোফিয়াকে গাঢ় স্বরে বলিল : একটা অনুরোধ করবো মিস্—রাখবে কি ?

পূর্ণ দৃষ্টিতে প্রিন্সের মুখের দিকে চাহিয়া সোফিয়া উত্তর করিল : কথাটা না শুনলে কি করে বলবো বলুন ?

কোন ভূমিকা না করিয়া সোজাসুজি ভাবেই প্রিন্স বলিল : মালা-ছড়াটি তুমি একবার গলায় দেবে ?

সোফিয়া : কেন বলুন ত ?

প্রিন্স : মালার বাহার খোলে গলায় উঠলে। যাঁর জন্যে মালা-ছড়াটি কিনছি, তাঁর চেহারাও অনেকটা তোমারই মতন। তোমাকে মানালে তাঁকেও মানাবে। তাই এই অনুরোধ। যদি অনুমতি কর মিস্—আমিই গলায় এটি পরিয়ে দিই।

বলিয়াই প্রিন্স মালাছড়াটি তুলিয়া ধরিল। কিন্তু পরক্ষণেই সোফিয়া সেটা তাড়াতাড়ি প্রিন্সের হাত হইতে লইয়া সহাস্যে বলিল : মেয়েদের গলায় মালা পরিয়ে দেবার অধিকার ত সব পুরুষের নেই প্রিন্স, আমিই পরছি।—বলিতে বলিতে সে মুক্তার মালাছড়াটি নিজেই গলায় পরিল।

মুগ্ধভাবে চাহিয়া প্রিন্স বলিল : খাসা মানিয়েছে তোমাকে মিস্। মালাছড়াটি সত্যিই সার্থক হয়েছে—মালার জন্য এই দোকানে আসা আর এটাকে সওদা করাও ব্যর্থ হয় নি।

সোফিয়া বলিল : এখন হোল ত ! দেখছি আপনার সখও অদ্ভুত ! দিন বাক্সটা, এটা প্যাক করে দিই।

কিন্তু সোফিয়াকে গলা হইতে মালাছড়াটি খুলিতে দেখিয়া বাধা দিয়া প্রিন্স বলিল : থামো, থামো, ওটা এখন খুলোনা, তোমার গলাতেই থাক।

সোফিয়া : খুলবো না মানে ? কি আপনি বলতে চান ?

প্রিন্স : ঐ আয়নাটির সামনে দাঁড়িয়ে দেখ—কি সুন্দর তোমাকে মানিয়েছে। সৌন্দর্যের উপাসক হয়ে তার হন্তারক আমি হতে পারবো না মিস্—কিছুতেই নয়। এখন ওটা তোমার গলাতেই থাকুক।

সোফিয়া : আমার গলাতেই থাকুক—কি ভেবে একথা আপনি বলছেন শুনি ?

প্রিন্স : কিছু ভেবে নয় সোফিয়া, শুধু সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে। আমার অনুরোধ—একান্ত অনুরোধ এখন ওটা তোমার গলাতেই থাক। সন্ধ্যার পর আমি নিজেই এসে ওটা নিয়ে যাবো। আমার এই অনুরোধ-টুকু রাখতেই হবে।

সোফিয়া : কিন্তু সন্ধ্যার সময় ত আমি দোকানে থাকি না, আমার ডিউটি পাঁচটা পর্যন্ত।

প্রিন্স : তাহলে তোমার বাড়ীর ঠিকানাটিই দাও ! ঠিক সাতটার সময় আমি সেখানেই যাবো। আমি নিজে যেচেই তোমার বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ নিচ্ছি সোফিয়া—এক সঙ্গেই আমরা চা খাবো। মনে রেখো, আমি আজ তোমার সন্ধ্যার অতিথি। আপত্তি আছে ?

সোফিয়া : এ কথার ওপর কোন আপত্তিই আর উঠতে পারে না। বেশ, যদি আপনি খুশি হন, তাই হবে।

বলিয়াই সে টেবিলের উপর হইতে তাহার ভ্যানিটি ব্যাগটি টানিয়া লইল। কিন্তু ব্যাগের ভিতরে তাহার নাম-ছাপা কার্ডটি পাওয়া গেল না,

হাতে উঠিয়া আসিল সদ্য তোলা তাহারই একখানি সুন্দর ফটো, নিচে তাহার নাম ও বাড়ীর ঠিকানা লেখা।

এক নজরে সেটি দেখিয়াই প্রিন্স চিলের মত ছোঁ মারিয়া তুলিয়া লইল, সঙ্গে সঙ্গে বুকের পকেটে রাখিয়া গম্ভীর মুখে বলিল: ব্যস, আর ভাবনা কি! এই দামী বস্তুটিই রইলো ঐ মালা ছড়াটির জামিন।

বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে সোফিয়া বলিল: কিন্তু এর পরে মালা না যদি মেলে?

স্নিগ্ধ দৃষ্টি সোফিয়ার মুখে নিবদ্ধ করিয়া প্রিন্স উত্তর দিল: কুচ পরোয়া নেই। জামিন থেকেই সব উসুল হয়ে যাবে। আচ্ছা, তাহলে গুড্‌বাই!

বলিয়াই সামনে ঝুঁকিয়া সাদরে সোফিয়ার হাতখানি ধরিয়া বার দুই ঝাঁকুনি দিয়া প্রিন্স বাহির হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে সোফিয়ার চোখ দুটি জ্বলিয়া উঠিল যেনো।

একটু পরেই গলা হইতে মালাছড়াটি খুলিয়া বাক্সে ভরিতে লাগিল সে। তাহার মানস-পটে ছায়ার মত ভাসিয়া উঠিতেছিল কল্পলোকের কত রূপরেখা!

সোফিয়ার ফটো-চিত্রখানির সংশ্রবে তাহার সহিত প্রিন্সের আলাপ ও সংযোগের ইহাই পূর্বাভাস।

চৌরঙ্গী-অঞ্চলে দেশীয় ও বিদেশীয় রক্তের সংযোগে উৎপন্ন যে মিশ্র জাতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় এবং পিতা বা মাতার বিশিষ্ট বর্ণের দোহাই দিয়া খৃষ্ট ধর্মের আশ্রয়ে যাহারা আভিজাত্যের দাবি করিয়া থাকে, ম্যাডাম মেরিনা সেই সম্প্রদায়ের এক ধনবতী মহিলা।

পার্ক ষ্ট্রীটে মেরিনার জুয়েলারী বিপনী এবং লিণ্ডসে ষ্ট্রীটের নিজস্ব

বাড়ীখানি তাঁহার প্রতিষ্ঠার পরিচয় দিয়া থাকে। কন্যা সোফিয়াকে নাবালিকা অবস্থায় রাখিয়া তাঁহার স্বামী কোহেন ইহলোক হইতে বিদায় লইলে মেরিনাকেই শক্ত হইয়া দোকানটি পরিচালনা এবং কন্যাকে মানুষ করিবার ভার গ্রহণ করিতে হয়। ডায়োসেসন্ কলেজ হইতে সোফিয়া যে-বছর আই-এ পাস করে, সেই বছরে এই সম্প্রদায়ের মায়ার নামক এক যুবার সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। কিন্তু 'কোর্টসিপ' করিয়া এই বিবাহ হয় নাই—হইয়াছিল মেরিনার একান্ত জিদ ও ইচ্ছায়। মায়ারের চেহারা চোখে না লাগিলেও তাহার বড়মানুষী চালচলন, কেতাদুরস্ত বিনয়নম্র আচরণ, ইউনিভারসিটির চারিটি ডিগ্রী, দামী মোটরগাড়ী, চাঁদনী চকের বাড়ী··সমৃদ্ধির এই নিশানাগুলি মেরিনার মনে রীতিমত মোহের সৃষ্টি করে। ফলে, তাঁহার ইচ্ছাটাই বড়ো দৃঢ় ও প্রবল হইয়া দুটি প্রাণে মিলনগ্রন্থী দেয়। শিক্ষিতা মেয়ে হইয়াও সোফিয়া মুখে কোন প্রতিবাদ করে নাই, মায়ের প্রকৃতিও তাহার অবিদিত নয়—যে ইচ্ছা একবার মনে জাগিয়াছে, পৃথিবীতে এমন মানুষ কেহ নাই—যুক্তি দেখাইয়া যে তাহার খণ্ডন করিতে পারিবে। স্কুলে শহরের কতিপয় অভিজাত বাঙালী পরিবারের কন্যাদের সহিত সোফিয়ার বন্ধুত্ব ঘটে, এবং প্রবেশিকা পরীক্ষার পর একসঙ্গেই তাহারা কলেজের ছাত্রী হয়। ম্যাট্রিক হইতে তাহাদের সঙ্গে সে-ও ইচ্ছা করিয়া 'ভারনাকুলার' সাবজেক্ট-এ বাংলা ভাষাকে পাঠ্যরূপ গ্রহণ করে। এই সূত্রে "রামায়ণী কথা", "মহাভারতের কথা", "কুললক্ষ্মী", "পতিব্রতা", "স্বয়ংসিদ্ধা", "শুভ সাধনা", "পুরাতনী", "বিন্দুর ছেলে" প্রভৃতি বইগুলি পড়িবার সুযোগ পায়, ফলে এই সকল গ্রন্থের মনস্বিনী মেয়েগুলির অপূর্ব্ব প্রকৃতির প্রভা তাহার উপর নূতন আলোকপাত করে। এই আদর্শেই সে নীরবে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া মায়ের ইচ্ছাই মানিয়া লয়।

বিবাহের পরেই কিন্তু 'চিচিং ফাঁক' হইয়া যায়। বিশ্বস্তসূত্রে মেরিনা জানিতে পারেন—জামাতা মায়ার তাঁহাকে ভয়ংকরভাবে ঠকাইয়াছে। ঘর-বাড়ী, টাকা-কড়ি, মোটর গাড়ী, এমন কি ইউনিভারসিটির ডিগ্রী পর্যন্ত প্রত্যেকটিই তাহার বাজে অর্থাৎ যাহাকে বলা চলে ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। মেরিনার একমাত্র কন্যাই তাঁহার প্রচুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী জানিয়া সোফিয়াকে বিবাহ করিবার জন্য আটঘাট বাঁধিয়াই সে চক্রান্তের জাল পাতিয়াছিল।

প্রকৃত ব্যাপার শুনিয়া মেরিনা একেবারে ক্ষেপিয়া উঠেন। ভণ্ড প্রতারক জামাতাকে উপযুক্ত প্রতিফল দিবার জন্য যখন তিনি আদালতের আশ্রয় লইবার জন্য জিদ ধরেন, আর সে সম্বন্ধে কন্যার কি মত জিজ্ঞাসা করেন, সেই সময় সোফিয়া মায়ের সামনে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে সেই প্রথম প্রতিবাদের ভঙ্গিতে বলে: বিয়ের আগে ত কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করনি মা, আজ জিজ্ঞাসা করে কি লাভ হবে শুনি?

ফাটিয়া পড়িবার মত হইয়া মা বলেন: একটা বদমায়েস নচ্ছার জোচ্চোরকে শায়েস্তা করে তোর ইজ্জত বাঁচানো—লাভ নয়? আমি তাকে জেলে পচিয়ে মারবো, তারপর তোর আবার বিয়ে দেবো।

সোফিয়া আপত্তির সুরে বলে: বিয়ে আমি আর করবো না।

মা বলেন: সে তখন দেখা যাবে, আগে ত ঐ হতভাগাটাকে 'ডাইভোর্স' করাই তোকে দিয়ে।

দৃঢ়স্বরে সোফিয়া বলে: তা হবে না মা, সে কেলেঙ্কারি আমি করতে দেব না! আমি ওকে 'ডাইভোর্স' করতে পারবো না···কিছুতেই নয়।

—তাহলে ঐ নচ্ছার পাজীটাকে নিয়েই ঘর করবি ঠিক করেছিস?

—তাছাড়া উপায় কি মা! বিয়ে যখন হয়ে গেছে, এখন এই নিয়ে হাঙ্গামা হুজ্জতি না করে মানিয়ে নেওয়াই ঠিক।

—কিন্তু বিয়ে হবার পরেও ত এমন কত হচ্ছে; কাজে মনে মিল যেখানে না হয়—ডাইভোর্স ত হবেই।

—তা হোক। যা'র যে রকম মর্জি, সে তাই করে। আমি কিন্তু বিয়েটাকেই বড় মনে করি; আর, আমার মতে সত্যিকারের বিয়ে জীবনে একবারই হয়ে থাকে।

—হুঁ, বুঝেছি···কলেজের বাঙালী ছুঁড়ীগুলো তোর মনে এই সব 'প্রেজুডিস' ঢুকিয়ে দিয়েছে।

...একে প্রেজুডিস্ বললে অন্যায় হবে না, মেয়ে মাত্রেরই এটা প্র্যাকটিস্ হওয়া উচিত।

যে মেয়ে মুখ তুলিয়া কোনদিন মায়ের সঙ্গে এভাবে তর্ক করে নাই, বিয়ের পরেই তাহাকে এভাবে মুখ খুলিতে দেখিয়া মা ত একেবারে রাগিয়া আগুন হইয়া উঠিলেন এবং সমস্ত রাগটুকু গিয়া পড়িল জামাতা মায়ারের উপরে। কারণ, সেই হতচ্ছাড়াটার পাল্লায় পড়িয়াই ত তাঁহার মুখচোরা মেয়ে এতখানি মুখরা হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হতভাগা ত এখন নাগালের বাহিরে; কাজেই মনের ঝাল মেয়ের উপর ফেলিয়া শাসনের সুরে ও ভঙ্গিতে জানাইয়া দেন: কিন্তু আমার বাড়ীতে বসে ওসব প্র্যাকটিস চলবে না তা বলে দিচ্ছি। আমার কষ্টের পয়সায় নবাবী চলবে না।

আরক্ত মুখখানি তুলিয়া সোফিয়া জিজ্ঞাসা করে: তাহলে কি-তুমি করতে চাও আমাদের সম্বন্ধে সেটা স্পষ্ট করে বলো। তুমি মা, পেটে ধরেছ, মানুষ করেছ, তোমার ঋণ সারা জীবনেও শোধ করতে পারবো না; এর ওপর যদি ঝগড়া করে চলে যাই, তাহলে নিমকহারামি করা হবে, আর সে পাপের বোঝা কোন দিন ঘাড় থেকে নামবে না। তেমনি, তুমি আমার ভালোর দিকে চেয়ে যার হাতে তুলে দিয়েছ, তাকে হেনস্তা

করলে কিংবা তার সঙ্গে সম্পর্ক কাটালে, সে-পাপও আমার সমস্ত জীবনকে বিষিয়ে তুলবে। দুটো দিক চেয়েই তুমি মা বলো—কি এখন উচিত?

মুখ বাঁকাইয়া মা মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে বলেন: যা উচিত সে ত আগেই আমি বলেছি, কিন্তু তুমি তাতে কান না দিয়ে পতিব্রতা সতী সেজে সোহাগী হতে গাও। কিন্তু তলিয়ে যদি বুঝতে, তাহলে জানতে পারতে—আমার বাড়ী দোকান সম্পত্তির পানে চেয়েই ঐ হতভাগা আমাকে বোকা বানিয়ে তোমাকে বিয়ে করেছে। যে এমন শয়তানি করতে পারে, ভুলেও ভেবো না তার মনে স্ত্রীর ওপর কোন দরদ বা ভালবাসা আছে। আমার এ অনুমান যে সত্যি, আমি সেটা তোমার চোখে আঙুল দিয়ে হাতে কলমে দেখিয়ে দেব।

দুঃখের মধ্যেও সোফিয়ার মুখে কৌতুকের রেখা ফুটিয়া উঠে। জিজ্ঞাসা করে সে: কি করে দেখাবে শুনি?

গম্ভীর মুখে মা বলেন: এক হপ্তার মধ্যেই দেখতে পাবে।

কয়েকদিন পরেই সোফিয়া সবিস্ময়ে দেখে—মায়ের যে ছাপোষা ভাইটি শহর হইতে মাইল বারো তফাতে বাটানগরে বাটা কোম্পানীর ফ্যাক্টরীতে উদয় অস্ত খাটিয়াও সচ্ছলভাবে সংসার চালাইতে সমর্থ না হওয়ার প্রতি মাসেই ধনবতী দিদিকে রীতিমত সাহায্য করিতে হইত—ফ্যাক্টরীর চাকরি ছাড়িয়া তিনি সপরিবার এখানেই বসবাস করিতে আসিয়াছেন। মা ব্যাপারটা খোলসা করিয়া দেন এই বলিয়া যে—নিজের পেটের মেয়ের চেয়ে মায়ের পেটের ভাইটিকেই তিনি বেশী আপনার ভাবিয়াই কাছে আনিয়াছেন এবং উইল করিয়া তাহাকেই তাঁহার দোকান ও সমস্ত সম্পত্তির 'অছি' করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—কন্যা সোফিয়াকে উপলক্ষ করিয়া তাহার স্বামী

মায়ার যাহাতে এই সম্পত্তির এক কপর্দকও হাতাইতে না পারে। তবে সোফিয়া যদি মায়ারকে ডাইভোর্স করিয়া মা বা মামার মনোনীত কোন সুপাত্রকে পুনরায় বিবাহ করে তাহা হইলে সমগ্র সম্পত্তির অর্ধাংশের উত্তরাধিকারিণী সেও হইতে পারিবে। আর যদি একান্তই সে পুনরায় বিবাহ না করে কিম্বা মায়ার তাহার ভার গ্রহণে সম্মত না হয়, তাহা হইলে বাড়ীর দুইখানি ঘর পঠদ্দশা হইতে যে-ভাবে সে ব্যবহার করিয়া আসিতেছে, আজীবন সেই ভাবেই ব্যবহার করিতে পারিবে। আর, এই বাড়ীতে থাকিয়া সে যদি জুয়েলারী দোকানে কাজ করিতে চাহে, তাহা হইলে মাসিক এক শত টাকা করিয়া হাত খরচ পাইবে।

উইলের এরূপ কঠোর সর্ত শুনিয়াও সোফিয়ার মন টলে নাই; ভণ্ড প্রবঞ্চক স্বামীকে তাহার ন্যায় রূপসী তরুণীর অযোগ্য জানিয়াও এবং এরূপ স্বামীর জন্যই তাহার ভাগ্য বিপর্যয় অনিবার্য বুঝিয়াও সে মত পরিবর্তন করে নাই। দৃঢ় স্বরে মাকে জানায়:—আমি ত তোমারই মেয়ে মা, কথা আমার নড়চড় হবে না, আমি মন স্থির করেই বলেছি—যাকে বিয়ে করেছি, সেই আমার স্বামী। কোন রাজপুত্র এসেও যদি আমাকে রাণী হবার জন্যে লোভ দেখায়, তবু আমার মত বদলাবে না।

মায়ের জিদও দৃঢ় হইতে থাকে। উইল রেজেষ্টারী হইয়া যায়। খবরের কাগজে উইলের মর্ম প্রচারিত হয়। খবরটা মায়ারের কানে গিয়াও পঁহুছায়। শাশুড়ীকে এড়াইয়া একদিন সে সোফিয়ার ঘরে আসিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করে: এ সব কি কাণ্ড শুনি?

সব কথাই তাহাকে শুনাইয়া দিয়া সোফিয়া অনুরোধ করে: তুমি আমাকে এ-বাড়ী থেকে নিয়ে চলো; মা'র ঐশ্বর্যের লোভ তুমি ত্যাগ করো। আমি এখানকার পয়সারও প্রত্যাশা করিনে।

মায়ার রাগিয়া বলে : তোমার মায়ের সম্পত্তির আশাতেই আমি তোমাকে বিয়ে করেছিলাম। উইলের কথা শুনে আমার মাও ক্ষেপে উঠেছেন। তিনি তোমাকে সহ্য করতে পারবেন না।

সোফিয়া বলে : তুমি আমাকে নিয়ে চলো তোমার বাসাতে। আমি তাঁকে ঠিক করে নেব।

সোফিয়া ভাবিয়াছিল—ভক্তি যত্ন পরিচর্যায় সে শাশুড়ীর মনের মধ্যে স্থান পাইবে, তাঁহাকে বাধ্য করিয়া ফেলিবে। কিন্তু মায়ারের মা আর এক প্রকৃতির নারী—দুনিয়ায় যাহারা শুধু স্বার্থকেই ভালো করিয়া চিনিয়াছে, বধূর অন্তরের চেয়ে তাহার পিতৃগৃহের অর্থের দিকেই যাহাদের লোলুপ দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। উইলের কথাটা রাষ্ট্র হওয়ায়—তাহার পুত্রকে বঞ্চিত করা হইয়াছে বুঝিয়া মায়ারের মা একেবারে তাতিয়া আগুন হইয়া উঠে। প্রচুর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা লইয়া সোফিয়া আসিলেও সে বহ্নিতে পুড়িয়া ছাই হইয়া যায়। বহু চেষ্টা যত্ন করিয়াও সে শাশুড়ীকে তুষ্ট করিতে পারে না। লক্ষ্য করে সে, মায়ারও যেন তাহাকে এড়াইতে চাহে। সব দিন বাড়ী আসে না। কি কাজ করে—কি ভাবে তাহার কর্মজীবন চলে, জিজ্ঞাসা করিয়াও সে সম্বন্ধে কিছুই সোফিয়া জানিতে পারে না। স্বামীর উপেক্ষা এবং শাশুড়ীর নির্যাতন যখন একেবারে সহ্যের সীমা অতিক্রম করে, তখন বাধ্য হইয়াই সোফিয়াকে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিতে হয়। উইলের শর্ত মত তাহার জন্য সুরক্ষিত বাড়ীর নির্দিষ্ট অংশটুকু সে ব্যবহার করিতে থাকে, সেই সঙ্গে মায়ের নির্দেশে তাহাকে জুয়েলারী দোকানেও বাহির হইতে হয়।

সোফিয়ার শশুর বাড়ীর সকল খবরই মা রাখিতেন। স্বামীর আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাব, শাশুড়ীর নিষ্ঠুর ব্যবহার, স্বেচ্ছায় দুর্ভাগ্যকে বরণ করিয়া দুর্ভোগের চরম অবস্থার সকল কথাই তাঁহার কানে আসিত।

তিনি প্রতীক্ষা করিতেন প্রত্যহই—কখন তাঁহার কন্যা অতিষ্ঠ হইয়া চলিয়া আসে এখানে, তাঁহার ব্যবস্থাই বরণ করিয়া লয়। যে দিন তাঁহার আশা-প্রতীক্ষা সার্থক হয়, শুধু গম্ভীর মুখে বলেন : হৃদয়হীন পর কখনো আপন হয় না, হাতে কলমেই ত দেখে এলে! আমি কঠিন হলেও অবিচার করিনি। তোমার অবস্থার বিচারক এখন তুমি নিজেই।

কন্যা কোন উত্তর দেয় নাই। নীরবেই উইলের সর্তগুলি মানিয়া কর্তব্যে অবহিত হয়। সোফিয়ার যোগদানের পরই দোকানের বেচাকেনা আশ্চর্য রকমে বাড়িতে থাকে। যুদ্ধের ব্যাপারে বাজার ত জমকাইয়া উঠেই, কিন্তু সোফিয়ার সুন্দর মুখ, হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিবার ভঙ্গি, মধুর ব্যবহার এক শ্রেণীর অভিজাত ক্রেতাকে এমনই আকৃষ্ট করিয়া তুলে যে, প্রয়োজন না থাকিলেও কোনও না কোন সামগ্রী কিনিবার অছিলায় দোকানে দর্শন দেয়, ধনীনন্দনদের সমাগমে শো-রুম যেন হাসিতে থাকে।

দোকানের সংস্রবে আসিয়াই ঘটনাচক্রে সে তাহার স্বামীর পেশা ও কর্মক্ষেত্রের সন্ধানটুকুও আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয়—শ্বশুর বাড়ীতে একটি বৎসর কাটাইয়াও কোন পাত্তাই যাহার বাহির করিতে পারে নাই সে। জোসী নাম্নী তাহারই এক সহপাঠিনী এবং তাহাদের সমাজেরই এক অনূঢ়া তরুণী রহস্যটি উদঘাটিত করিয়া দেয়। সে-ই একদিন সোফিয়াকে বলে : তোর বর যে প্রিন্স নন্দলালের এডিকঙ হয়েছে রে!

বিস্মিত হইয়া সোফিয়া জিজ্ঞাসা করে : প্রিন্স নন্দলাল আবার কে?

জোসী : সে কিরে, প্রিন্স নন্দলালের নাম শুনিস নি? বিংশ শতাব্দীর কলকাতার প্রিন্স অফ ওয়েলস্? রেনাল্ড্স্-এর মতন নির্ভীক রিয়েলিষ্টিক অথার কেউ যদি থাকতেন ত 'মিষ্ট্রি অফ দি রোম্যান্স অফ ক্যালক্যাটা' লিখে ফেলতেন।

সোফিয়া : বিয়ে করিস নি এখনো তাই রোম্যান্সের স্বপ্ন দেখছিস্ আর মিষ্টির পিছনে ঘুরছিস, কিন্তু আমার সে ফুরসৎও নেই, ইচ্ছেও নেই। আমার জীবনের সব সাধই মিটে গেছে।

জোসী : অমন কথা বলিস নি সোফি, শুনলেও কষ্ট হয়। কলেজের মধ্যে তুই ছিলি সব রকমে সব মেয়ের সেরা ; রূপের চটকে, হাসির গমকে, আমোদে আহ্লাদে সব সময়ই ফেটে পড়তিস যেনো! কিন্তু আশ্চর্য বিয়ের পরেই একবারে বদলে গেছিস! কোথায় গেল সে সব ঝাঁজ তোর—ঐ ইষ্টুপিড বরটাকে সযুত করে গোলাম বানাতে পারলি নি? তোর বর একটা বড় লোকের ছেলের মোসাহেবি করছে। তার লালসার বহ্নিতে ইন্ধন যোগাচ্ছে, চৌরঙ্গী অঞ্চলের রূপসী মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছে—এসব কথা মনে হলে লজ্জায় সত্যিই মরে যেতে ইচ্ছে করে।

স্বামীর পেশা ও প্রবৃত্তি সংক্রান্ত এই নোংরা কথাগুলি সোফিয়ার অন্তরের একটা নিভৃত অংশের উপর প্রখর আলোকপাত করে। সেই আলোকে নিদ্রিত অন্তরদেবতাও বুঝি জাগ্রত হইয়া উঠেন। সত্যই ত, অদৃষ্টের উপর অভিমান করিয়া সময়ের স্রোতে জীবনকে ভাসাইয়া দেওয়ায় কোন সার্থকতা ত নাই! মত লইয়া, আদর্শ লইয়া স্বামীর সঙ্গে গরমিল হইলে স্বামীর সংস্পর্শ কাটাইয়া তফাতে সরিয়া আসায় বাহাদুরি কিছুই নাই ; বরং দুঃখ কষ্ট অসুবিধা সব সহ্য করিয়া স্বামীর সংসারে থাকিয়া স্বামীর মনের ওপর প্রভাব বিস্তার করাই হইতেছে এই অবস্থায় বুদ্ধিমতী স্ত্রীর একান্ত কর্তব্য।… এই চিন্তাই ক্রমশ সোফিয়ার মনোরাজ্য আচ্ছন্ন করিতে থাকে। ফলে নব নব সূত্র বাহির হইয়া তাহার বুদ্ধিকে, তীক্ষ্ণ প্রতিভাকে দীপ্ত এবং নারীত্বকে প্রসারিত করিয়া তোলে। নারী-রূপ-লোলুপ এই লম্পট প্রিন্সটিকে শায়েস্তা করিতে এবং সেই সঙ্গে তাহার অপদার্থ স্বামীর ভুল ভাঙিয়া দিয়া জ্ঞান চক্ষু খুলিয়া দিতে সম্ভব ও অসম্ভব

কত কল্পনাই তাহার মস্তিষ্কে জট পাকাইতে থাকে! মাঝে মাঝে কল্পনার উপর আশ্চর্য রকমে যখন বাস্তবের আলোকপাত হয়—কল্পলোকের বিচ্ছিন্ন সূত্রগুলি গ্রন্থিবদ্ধ হইবার সুযোগ পায়, সে নিজেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। প্রিন্স ও তাহার স্বামীর সম্বন্ধে বিভিন্ন মুখে বিভিন্ন বার্তা তাহার অন্তরে কৌতূহল সৃষ্টি করিতে থাকে।...এই বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যেই কলিকাতা শহরের বুকের উপর বসিয়া এই প্রিন্সটি যেন আড়াই শ বছর আগেকার এই বাংলা দেশেরই কোন খেয়ালী নবাবের মতন নারীর রূপ লইয়া ছিনিমিনি খেলা সুরু করিয়াছে! যে নারীর রূপে কিছুমাত্র বৈচিত্র বা বিশেষত্ব থাকে—প্রিন্সের দৃষ্টিতে একবার পড়িলে আর তাহার নিস্তার নাই! তোষামোদ করিয়া টাকা ঢালিয়া ব্যয়ের ব্যাপারে চমক লাগাইয়া প্রিন্স তাহাকে আয়ত্ত করিবেই। কিন্তু প্রিন্সের রূপের নেশা নাকি এই পর্যন্তই; সম্পূর্ণভাবে আয়ত্তে আনিয়া ক্ষুধিত দৃষ্টিতে রূপসুধা উপভোগ করিয়া চোখের ক্ষুধা মিটাইয়াই পরিতৃপ্ত হয় সে ··ইহার জন্যই এত তোড়জোড়, উদ্যোগ আয়োজন, অর্থ বৃষ্টি। মধ্যযুগের সেই খেয়ালী নবাবটিও এইভাবে চোখের ক্ষুধা মিটাইত নব নব রূপসীকে বহু যত্নে ও বহু ব্যয়ে ক্ষুধিত চক্ষুর সম্মুখে আনিয়া।...কিন্তু প্রিন্সের এই অপরূপ নেশার গোপন রহস্য শুধু তাহারাই জানে—যাহারা একদা অর্থের মোহে প্রিন্সের সঙ্গলাভ করিয়াছে। প্রচুর অর্থ ও বিবিধ সুযোগ-সুবিধা পণ স্বরূপ লইয়া তথাকথিত বিলাসিনীরা প্রিন্সের ক্ষুধানলে নারীত্ব ডালি দিতেই আসে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই রূপপিয়াসী পুরুষটির আশ্চর্য আচরণ তাহাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করিয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত চোখে অতৃপ্তি না আসে, সেই পর্যন্তই বাঞ্ছিতা ও আনীতা রূপসী পায় প্রিন্সের সঙ্গ। একত্র পান-ভোজন, গল্প-গুজব, নিবিড়ভাবে মেলা-

মেশা—এইগুলিই খেয়ালী প্রিন্সের বিলাস। যেন সে দেখাইতে চায়, তাহার সঙ্গিনীকে সে যখন নিজের যোগ্যতায় জয় করিয়া আনিয়াছে—জয়লব্ধ বস্তুটিকে লইয়া যাহা ইচ্ছা করিবার পূর্ণ ক্ষমতা তাহার থাকিলেও চোখের ক্ষুধাটুকু মিটাইয়াই সে তৃপ্ত, দৈহিক ক্ষুধার কোন আকর্ষণই তাহাকে প্রলুব্ধ করে না। অধিকাংশ রূপসীই ইহাতে বিরক্ত ও নিরুৎসাহ হয়; কেহ কেহ বা 'আজ না হইতে পারে হতে পারে কাল' এই প্রবচনটি ভাবিয়া প্রিন্সের পুনরাহ্বান প্রত্যাশায় লালায়িত থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় আহ্বান কাহারও উদ্দেশে যেমন আসে না—কাহারও সহিত স্থান বিশেষে সহসা দেখাসাক্ষাৎ হইলেও প্রিন্স এমনই গম্ভীর হইয়া পড়ে যে কেহই তাহার সামনে গিয়া প্রীতি সম্ভাষণেরও সাহস পায় না।

প্রিন্সের সম্বন্ধে এমনই কত বিস্ময়কর কাহিনীই সোফিয়ার কৌতূহল উদ্রিক্ত করিতে থাকে। এক একবার তাহার ইচ্ছা হয় যে সাহস করিয়া সে একদিন এই অপব্যয়ী খেয়ালী মানুষটির সামনে গিয়া তাহার এই সব অনাচার সম্পর্কে কৈফিয়ৎ চায়; জিজ্ঞাসা করে—তাহারই সমাজ ও জাতির একটা বৃহৎ অংশ যে-সময় এক মুঠা অন্নের অভাবে অনাহারে পথে পথে মৃত্যুবরণ করিতেছে, তাহার পক্ষে তখন ভিন্ন সমাজের মেয়েদের লইয়া ছিনিমিনি খেলা—টাকা ছড়ানো কি ভয়ংকর অন্যায় নয়?

কিন্তু যেদিন এই দুঃসাহসিক কল্পনাটি তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হয়, সেই দিনই এই খেয়ালী প্রিন্সটির জীবনের আর একটা প্রচ্ছন্ন দিক উদ্ঘাটিত করিয়া দেয় তাহার বান্ধবী জোসী। সে জানায়: প্রিন্সের আর একটা কীর্তি শুনেছিস সোফি, খবরের কাগজে হাংগার প্যারেডের কথা পড়ে পড়ে তার নাকি খেয়াল হয়েছিল একদিন স্বচক্ষে সেটা দেখবে! তাই তার রোলস্ রয়েসে চড়ে সফরে বেরোয় শহরের রাস্তায়। সঙ্গে যায় তোর বয় আর সেই ট্যারা বেকার। মিছিল দেখে প্রিন্স

ভিরমি যায় আর কি ! পকেট থেকে পার্সটা বার করে তোর বরের হাতে দিয়ে বলে—এই টাকায় এদের সবাইকে পেট ভরে খাইয়ে দাও আর কাল থেকে একশো করে টাকা দৈনিক বরাদ্দ করা গেলো—এক একটা অঞ্চলে গিয়ে এমনি করে খাওয়াবে কিন্তু খবরদার, আমার নাম যেন প্রকাশ না পায়—বলেই প্রিন্স তার 'কার' বেখে একটা ফিটন ভাড়া করে চলে যায়।

সোফিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করে: কিন্তু এ খবর তোকে কে দিলে ? এ যে সত্যি তার কি প্রমাণ আছে।

জোসী বলে: প্রিন্সের সোফার আমার বাবাকে বলেছে। তুই বোধ হয় শুনিসনি, বাবা প্রিন্সের ব্যাভারে ভারি চটে গিয়েছিলেন, তিনি ওর বিরুদ্ধে গবর্ণরের সেক্রেটারীকে বলবেন ঠিক করেছিলেন পর্যন্ত। কিন্তু সোফারের কাছে ওদিনের খবরটা পেয়ে বাবার মত বদলে যায়। তিনি বলেন—বাইরে থেকে ঝাপ্‌সা দেখে আর পরের মুখে শুনে কারো বিচার করা ঠিক নয়। হাঁ, ভাল কথা, আসল কথাটা বলতে ভুলে গেছি। প্রিন্স যে খয়রাৎ ওদিন করে যান আর রোজকার জন্য একশো টাকা করে খয়রাতি বরাদ্দ হয়, তার বেশীর ভাগ ওঠে তোর বর আর ঐ ট্যারাটার পকেটে। প্রথম দিনে সোফারকে ওরা ঐ পার্স থেকে পঁচিশ টাকা দিতে গিয়েছিল কিন্তু সে নিজে না নিয়ে কি করেছিল শুনবি ? টাকাগুলো ভাঙ্গিয়ে ভিখিরীদের বিলিয়ে দিয়েছিল ওদের সামনেই।

ইহার পর সোফিয়ার উৎসাহ শিথিল হইয়া পড়ে। দুঃসাহসে ভর করিয়া প্রিন্সের সম্মুখে গিয়া তাহার আচার সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাহিবার ! বরং ধীরে ধীরে তাহার অন্তরে এই অদ্ভুত মানুষটির প্রতি কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধাও সঞ্চিত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার নারী-মন বিষাইয়া উঠে অমানুষ স্বামীর সভ্যকার পরিচয় পাইয়া। সর্বক্ষণই সে সুযোগ প্রতীক্ষা করিতে

থাকে কি ভাবে কি উপায়ে কি পথ ধরিয়া সে তাহার দুর্ভাগ্য স্বামীকে ফিরাইয়া আনিবে পাপের এই পিচ্ছিল পথ হইতে! এক এক সময় তাহার মনে এই ইচ্ছাও জাগ্রত হইয়া উঠে যে অতর্কিত ভাবে একদা সে প্রিন্সের সম্মুখে গিয়া হাজির হইবে—তাহার স্বামীকে নিষ্কৃতি দিবার জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইবে। কিন্তু সে শুনিয়াছে, প্রাসাদে সর্বক্ষণই তাহার স্বামী প্রিন্সের সংস্পর্শে থাকে। তাহা ছাড়া, প্রিন্সের প্রাসাদে প্রবেশ করা এবং সেথান হইতে বাহির হইয়া আসার অর্থই হইতেছে একটা বিশ্রী কলংককে চিরসাথী করিয়া লওয়া। সব চেয়ে চিন্তা ও বিস্ময়ের কথা ইহাই যে, যাহার চিন্তায় তাহার সমগ্র অন্তরটি আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেই মানুষটির সহিত একটিবারও তাহার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে নাই এ পর্যন্ত!

অবশেষে সেদিন অপ্রত্যাশিত এবং একান্ত আশ্চর্য ভাবেই সেই অতি বাঞ্ছিত ও অপরিচিত মানুষটী নিজেই সোফিয়ার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়ায় একছড়া মুক্তার মালা কিনবার উদ্দেশ্যে।

বাড়ীর যে দুইখানি ঘর সোফিয়া ব্যবহার করিয়া থাকে, সামনে খানিকটা বারান্দা থাকায় স্বতন্ত্র একটা অংশের মত মনে হয়। সুশ্রী ও দামী আসবাবপত্রে দুইখানি ঘরই সাজানো। প্রথম ঘরখানিতে প্রবেশ করিলেই দেওয়াল সংলগ্ন কাঁচের আলমারিগুলির মধ্যে শ্রেণীবদ্ধ স্বর্ণখচিত বাঁধানো গ্রন্থাবলীর সৌন্দর্য চক্ষুকে আকৃষ্ট করে। ঘরের মেঝেটি আগাগোড়া রঙ্গিন মাদুর দিয়া মোড়া। মাঝখানে ডিম্বাকৃতি একটা মারবেল টেবিল, তার দুই ধারে দুইখানি কুশন চেয়ার। টেবিলের মাঝখানে একটা বাহারি ফুলদানী, ঘরের দরজায় ও জানালায় নেটের পরদা। কোণের দিকে টেবিল-সংলগ্ন অরগ্যানটা ঘরখানির সৌন্দর্য বাড়াইয়া দিয়াছে।

দোকানে সোফিয়ার ডিউটী দশটা থেকে অপরাহ্ণ পাঁচটা পর্যন্ত; তারপর সে স্বাধীন। সোফিয়া ভালো করিয়াই জানে, শহরের কোন অভিজাত ঘরের ছেলের সঙ্গে যদি সে মেলামেশা করে বা আলাপ জমায় তাহাতে তাহার মায়ের পক্ষ থেকে কোন আপত্তিই উঠিবে না, বরং তিনি খুসিই হইবেন। এ-বাজারে যাহারা কোন এক্‌ষ্ট্রা-অর্ডিনারী জুয়েলারী সখ করিয়া কিনিতে আসে দোকানে, তাহারা যে সাধারণ ক্রেতা নয়—খুব সাঁশালো গোছের লোক, ইহা জানিয়াই ইদানীং মাথা খেলাইয়া তিনি দোকানের এক নিভৃত অংশে ড্রইং-রুমটার ব্যবস্থা করেন আর কন্যা সোফিয়ার উপরে দেন তাহার চার্জ। উদ্দেশ্য, বিলাসী ধনীনন্দনদের সংস্পর্শে ও সহবতে যদি হা-ঘরে হতভাগা স্বামীর প্রতি কন্যার একমুখী বন্য প্রবৃত্তির কোন পরিবর্তন ঘটে। মায়ের আসল উদ্দেশ্যটুকু কন্যার নিকট অধিক দিন প্রচ্ছন্ন থাকে নাই। ঘৃণায় সর্ব্বাঙ্গ তাহার রী-রী করিয়া উঠিলেও অবস্থার ফেরে সবই তাহাকে সহ্য করিতে হয়। তবে সেই সঙ্গে সংযমের সাঁজো-য়াটি আরো শক্ত ও দুর্ভেদ্য হইতে থাকে। সে যাহাই হউক, দোকানের কোনো ধনাঢ্য গ্রাহককে কন্যা যদি দোকানের ডিউটীর পর নিজের ঘরে আমন্ত্রণ করিয়া চা খাওয়ায় এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিশ্রান্তালাপে কাটাইয়া দেয়, তাহাতেও মায়ের পক্ষ হইতে কোন আপত্তিই যে উঠিবে না, বরং কন্যার বুনো প্রকৃতি সভ্যতার পথের সন্ধান পাইয়াছে জানিয়া খুশিতেই ভরিয়া উঠিবে—এ সম্বন্ধে সোফিয়া নিঃসন্দেহ ছিল বলিয়াই দোকানে বসিয়া প্রিন্সের মত নামজাদা অভিজাত ধনীর প্রস্তাবে সম্মতি দেওয়া তাহার পক্ষে সম্ভব হয়।

স্বভাবতই সোফিয়ার ড্রইংরুমটী ভালো করিয়া সাজানো থাকে। এদিন ছুটির পর নিউ মারকেট হইতে নানারকম ফুল আনিয়া ঘরখানির সৌন্দর্য আরও মনোজ্ঞ করা হইয়াছে। চায়ের আনুষঙ্গিক উপচারগুলির

নির্বাচনীও তাহার উন্নত রুচির পরিচয় দিতেছে। কিন্তু গৃহসজ্জা ও আহার্যে বিলাসের প্রাচুর্য থাকিলেও নিজের সাজ-সজ্জায় তাহার কোন নিদর্শন নাই। তাই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াই রুচি-বিলাসী প্রিন্সকে যুগপৎ চমৎকৃত ও ক্ষুব্ধ হইতে হইল।

এ-পর্যন্ত যতগুলি মেয়ের সংস্পর্শে প্রিন্সকে আসিতে হইয়াছে, গৃহস্থালী ব্যাপারে এতখানি উন্নত রুচি কাহারও দেখে নাই এবং এত সাধারণ ও অনাড়ম্বর পোশাক পরিয়া কেহ তাহার সঙ্গে চায়ের টেবিলে বসে নাই। প্রিন্সের মনে হইল, দোকানের ষ্ট্রং-রুমে বরং অধিকতর বাহারি পোশাকে অঙ্গসজ্জা করিয়াছিল সে। তাহা হইলেও এই সাদাসিধা সাধারণ পরিচ্ছেদে স্বভাব রূপসী সোফিয়ার স্বাভাবিক রূপশ্রী এতটুকুও ম্লান হয় নাই যেন।

কালো রঙের রেশমী-পাড়বসানো সাদা জমিন পারসী-প্যাটার্নের একখানি সাড়ী তাহার পরণে ছিল, ব্লাউসটীও সাড়ীর মতনই সাদাসিধা এবং গলাটী সন্তর্পণে আঁটা—এ-সমাজের মেয়েদের পক্ষে সত্যিই যেটা অভিনব! শাড়ীর আঁচলটীও বাঙালী সধবা মেয়েদের অনুকরণে মাথার দিকে সীমন্ত পর্য্যন্ত তোলা ও পীন দিয়ে আঁটা। সুষ্ঠু পরিচ্ছদ-সম্পর্কে এই শালীনতা রূপবিলাসী প্রিন্সকে শুধু যে মুগ্ধ করে তা নয়—নারী-রূপের এক অপূর্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি তাহার কলুষিত দৃষ্টিকে আঘাত দিয়া সশ্রদ্ধ করিয়া তোলে। তাহার পর মুখখানি নির্মল হাসিতে ভরাইয়া এমন বিশুদ্ধ ভঙ্গিতে যুক্তকরে সোফিয়া তাহাকে নমস্কার জানাইয়া অভ্যর্থনা করে যে, প্রিন্স অবাক হইয়া যায়, সেই সঙ্গে করমর্দনের জন্য প্রসারিত হাতখানি গুটাইয়া প্রত্যভিবাদনে তাহাকেও নমস্কার করিতে হয়।

অভিবাঞ্ছিতা এক নারীর চাঞ্চল্যকর রূপ চুম্বকের শক্তিতে যাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে এবং পতঙ্গের মতন যাহাকে আসিতে হইয়াছে আকৃষ্ট

হইয়া তাহার অভিমুখে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সে রূপের একি আশ্চর্য্য পরিবর্তন!

স্তব্ধভাবে প্রিন্সকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সোফিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল: ওকি, দাঁড়িয়ে রইলেন যে—বসুন!

নির্দিষ্ট চেয়ারখানি ধরিয়া প্রিন্স বলিল: দাঁড়াও, দেখাটা আগে শেষ হোক!

সোফিয়া: কি দেখছেন বলুন ত?

প্রিন্স: অনেক; তোমার সাজানো ঘরখানি, ঘরের আলমারি,—তারপর তোমাকে।

সোফিয়া: আমি ত পুরানো হয়ে গেছি, নতুন করে দেখবার কিছু আছে নাকি?

প্রিন্স: আছে বৈকি। ওবেলা দোকানে যে-রূপ তোমার দেখেছিলুম, এখন তা খুঁজে পাচ্ছিনে; তুমি যেন আলাদা মানুষ হয়ে আমাকে অভ্যর্থনা করছ।

সোফিয়া: আমিও অবাক হয়ে ভাবছি, এখানে এসেই আপনি দমে গেলেন কেন? যাই হোক, এসেছেন যখন—দয়া করে বসুন ত! আমি চট করে জলটা গরম করে আনি।

বলিয়াই সোফিয়া একটু সরিয়া ঘরের কোণটির দিকে গেল। দুটি আলমারির পাশে খালি স্থানটুকুর উপর ইলেকট্রিক ষ্টোভে কেটলিটি বসানো ছিল। সুইচ টিপিয়া দিতেই তাহার ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

কুশন-দেওয়া চেয়ারখানিতে বসিয়া নিবদ্ধ দৃষ্টিতে প্রিন্স চাহিয়াছিল তাহার পানে। মিনিট কয়েকের মধ্যে জল তৈরী হইলেই কেটলিটি লইয়া সে টেবিলের কাছে আসিল। সেখানে চায়ের সরঞ্জাম সব প্রস্তুত ছিল। টি-পটে জলটুকু ঢালিয়া কেটলিটি যথাস্থানে রাখিয়া টেবিলের

অপর পার্শ্বে প্রিন্সের ঠিক সামনের আসনখানিতে বসিল সে। প্রিন্স লক্ষ্য করিতেছিল—মুখের হাসিটুকু তাহার মুখে লাগিয়াই আছে বরাবর, আর চোখ দুটি হাতের কাজেই নিবদ্ধ।

প্রিন্স সহসা প্রশ্ন করিল : এখানে এসে অবধি দেখছি তুমি একা, সাহায্য করতে কেউ নেই।

পিয়ালায় চা ঢালিতে ঢালিতে সোফিয়া উত্তর দিল : আমি এখানে একলাই থাকি, কাজকর্মও সব নিজের হাতেই করি। অবিশ্যি, আমার মা, মামা, মামী গার্জেন হয়ে মাথার ওপরেই আছেন, ওদিকে তাঁরাও থাকেন, চাকরবাকরও আছে ; কিন্তু আমি একটু নিরালায় থাকি, আর নিজের হাতে কাজ করতেই ভালবাসি ; কোন বিষয়েই কারো সাহায্য নেওয়া আমি পছন্দ করিনে।

চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিয়া প্রিন্স বলিল : বাঃ! চমৎকার চা করেছ ত? কলকাতার সেরা বাবুর্চি রসিদ মিঞা আমার চা তৈরী করে। দুশো টাকা তার মাইনে। কিন্তু তার চেয়েও তোমার হাতের চা মিষ্টি লাগছে সোফিয়া।

স্যাণ্ডউইচের ডিসটি আগাইয়া দিয়া সোফিয়া উত্তর করিল : সখের খানা সত্যিই মিষ্টি লাগে, আনাড়ী রাঁধলেও।

হঠাৎ প্রিন্সের নজর পড়িল, সোফিয়া শুধু তাহাকেই পরিবেষণ করিতেছে, নিজে একেবারে নির্লিপ্ত। পিয়ালাটি নামাইয়া সে বলিল : তাইত, লক্ষ্যই করিনি তুমি শুধু আমাকেই খাওয়াচ্ছ! তোমার চা কই?

মৃদু স্বরে সোফিয়া বলিল : আমি চা খাই না। কিন্তু সেজন্য আপনি কুন্ঠিত হবেন না ; মেয়েদের খাইয়েই তৃপ্তি, নিজের খাওয়াটাকে তারা তুচ্ছ ভাবে।

প্রিন্স : তোমার মুখেই একথা শুনছি শুধু। অনেক মেয়েদের সঙ্গে মিশেছি, এক সঙ্গে খেয়েছি, কিন্তু খাওয়াটাকে তুচ্ছ করতে কাউকে কোনদিন দেখিনি। এখন মনে হচ্ছে আমি তোমাকে ভুল বুঝেছিলুম।

সোফিয়া : কি বুঝেছিলেন বলুন ত ?

প্রিন্স : চৌরঙ্গী অঞ্চলে তোমার বয়সের অধিকাংশ মেয়েদের দলে তোমাকেও ফেলেছিলুম! কিন্তু এখানে এসেই বুঝেছি—তুমি ও-দল ছাড়া, আলাদা এক জাতের মেয়ে।

সোফিয়া : এসেই বুঝে ফেললেন ? আলাপের গোড়া থেকে আপনার ইচ্ছার তালে তালে পা ফেলে চলেছি স্বচক্ষে দেখেও ?

প্রিন্স : কেন, এখানে এসে এক নজরে তোমাকে দেখেই ত বলেছি সোফিয়া, তুমি বদলেছ।

সোফিয়া : রূপ বদলেছি মানে ? দোকানে যখন প্রথম দেখেন আমাকে…

প্রিন্স : সে রূপ তুমি ছেড়ে ফেলেছ সোফিয়া! তোমার পোশাক, তোমার দৃষ্টি, তোমার ভঙ্গি—প্রত্যেকটি আমি আলাদা দেখছি। যেরূপ দেখতে আমি অভ্যস্ত তারই একটু উন্নত আভাস পেয়েছিলুম দোকানে। তাই সখ করে নিমন্ত্রণ নিয়েছিলুম সোফিয়া।

সোফিয়া : সেই সঙ্গে কি প্রত্যাশা করেছিলেন, দয়া করে বলবেন ?

প্রিন্স : এক্ষেত্রে আর সব মেয়ে যা করে থাকে। প্রথমেই ত রূপ-সজ্জার যত কিছু উপাদান আছে সর্বাঙ্গে চড়িয়ে চোখ ঝলসে দেবার চেষ্টা করবে। তারপর কত রকমের আবদার যে তুলবে—সে সব আর কহতব্য নয়।…এই এক ঘেয়ে ব্যাপারটা ঘুরিয়ে তার উল্টো দিকটা তুমিই আজ দেখিয়ে দিলে সোফিয়া!

সোফিয়া : সত্যিই ?

প্রিন্স : আমাকে যাই ভেবে থাকো সোফি, যে কোন মেয়ের বাহ্যিক রূপ দেখে আমি তার ভিতরটাও জানতে পারি। তোমার সম্বন্ধে প্রথমে ধোঁকায় পড়েছিলুম সত্যি, কিন্তু এখানে এসে এক নজরে তোমাকে দেখেই চমকে উঠি ; প্রথমেই তোমার লজ্জা মনে জাগায় শ্রদ্ধা, তারপর মুখের ম্লান হাসি, চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টি নীরবে এমনি আঘাত দেয় যে তোমার পানে চাইতেও আমার মাথা যেন হেঁট হয়ে যায় লজ্জায়।

সোফিয়া : মনের কথাটাও বলুন, খুব রাগ হয়েছে নিশ্চয়ই !

প্রিন্স : রাগ ? না, না, না, নিশ্চয়ই না। তোমার গৃহ দেখে এমনই একটা গৃহস্থালীর কথা মনে আমার ফুটে ওঠে—যেখানে তুমি সর্বময়ী গৃহিণী হয়ে সংসারটি সব দিক দিয়ে আনন্দময় করে তুলেছ !

সোফিয়া : মনের কল্পনা মনেই থাকে, সবার পক্ষে সব সময় সত্যি হয় না প্রিন্স ! গল্প-উপন্যাসেও পড়া গেছে—যে যা চায়, ঠিক তাই পায় না। আপনাদের সমাজে এ সম্বন্ধে একটা প্রবচন আছে, সেটি আমার খুব ভালো লাগে।

প্রিন্স : বাংলা প্রবচনও তুমি জানো নাকি ?

সোফিয়া : স্কুল থেকেই বাঙালী মেয়েদের সঙ্গে এক সঙ্গে পড়েছি কি না, ভারনাকুলারে আমার সাবজেক্ট ছিল বাংলা, আই-এতেও বাংলা নিই। তাই বাংলা ভাষার কিছু কিছু জানি।

প্রিন্স : কলেজেও পড়েছ তাহলে ? কতদূর এগিয়েছ জানতে পারি ?

সোফিয়া : বেশী দূর নয়। অই-এ পাশ করবার পরই ও রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়—নতুন রাস্তায় পাড়ি দিতে হয়।

প্রিন্স : তার মানে ?

সোফিয়া : কথায় খেই কিন্তু আমরা হারিয়ে ফেলেছি ; বাংলা প্রবচনটা শুনবেন না ?

প্রিন্স : সরি ! ভুলে গিয়েছিলুম তোমার পড়ার কথায়, আচ্ছা বল।

সোফিয়া : প্রবচনটা হচ্ছে—

অতি বড় সুন্দরী—না পায় বর,

অতি বড় ঘরণী—না পায় ঘর !

উপমাটি বেশ প্রাঞ্জল নয় ?

প্রিন্স : কিছু আগে যে-কথা তুমি বলছিলে—যে যা চায় ঠিক তা পায় না—ঠিক মিলে যাচ্ছে এর সঙ্গে। তবে আমার মনে হয়—অন্তত তোমার মত মেয়ের পক্ষে একথা খাটে না। ইচ্ছা করলেই তুমি ঘর-বর দুইই পেতে পারো।

সোফিয়া : তাহলে সেই কথাই এসে পড়ে—কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিল সব সময় হয় না। আমাকে প্রথম দেখেই যে ভুলগুলি করেছিলেন আপনি, একটা বড় রকমের ভুল এখনো রয়ে গেছে আপনার মনে—ধরতে পারেন নি এখনো।

আস্তে আস্তে বিঁধাইয়া বিঁধাইয়া কথাগুলি বলিয়া সোফিয়া মর্মস্পর্শী দৃষ্টিতে একটিবার প্রিন্সের দিকে চাহিল। প্রিন্সের মনে হইল সেই গভীর দৃষ্টির সঙ্গে তাহার সামনে উপবিষ্টা এই অদ্ভুত মেয়েটির অন্তরের এমন একটা রহস্য ফুটি ফুটি করিতেছে, সত্যই এতক্ষণের আলাপেও তাহার দৃষ্টিতে যাহা ধরা পড়ে নাই। চোখের গোল গোল তারা দুটি স্থির ও তীক্ষ্ণ করিয়া সে আর একবার এই মেয়েটির পানে চাহিল।

ইহাদের দীর্ঘ সংলাপের মধ্যে নিবিষ্ট মনে সোফিয়া যেমন তাহার পরিবেষণ কাজটি সুষ্ঠুভাবেই চালাইয়া যাইতেছিল, প্রিন্সও তেমনি নিজের অজ্ঞাতেই যেন মুখরোচক সুস্বাদু আহার্য্যগুলির সদ্ব্যবহার করিতেছিল। এই সময় সোফিয়াকে স্বহস্তে ভুক্তাবশেষসহ পাত্রগুলি তুলিয়া লইয়া যাইতে

দেখিয়া প্রিন্স জোরে একটি নিশ্বাস ফেলিয়া তাহার স্থির ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পার্শ্ববর্তী স্ক্রীনটির দিকে ফেলিল।

পার্শ্বের ঘরের দরজাটির উপরে স্ক্রীনটি পরদার মত ঝুলিতেছিল। আসন হইতে উঠিয়া প্রিন্স তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর সেটি সরাইয়া ধীরে ধীরে ভিতরের ঘরটির ভিতর প্রবেশ করিল।

ঘরখানি আরও ছোট, কিন্তু সুন্দরভাবে সজ্জিত। জানালার দিকে একটি শয্যা। দেওয়ালে পৃথিবীর মহাপুরুষদের বাঁধানো ছবিগুলি দিব্য মানাইয়া টাঙানো—ধর্ম প্রচারে ও কর্মের ব্যাপারে যাঁহাদের খ্যাতি মানুষ মাত্রই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুশ্রী র‍্যাকের উপর কয়েকটি সুটকেস, আনালায় পরিধেয় পোশাক পরিচ্ছদ।

গার্হস্থ্য-জীবন-যাত্রার ধারা সম্পর্কে এই খেয়ালী প্রিন্সটি বরাবরই ছন্নছাড়া; গৃহস্থালীর কোন বালাই তাহার নাই। কাজেই সম্পূর্ণভাবে পৃথক এক সমাজভুক্ত এই মেয়েটির গৃহসজ্জা ও গৃহস্থালীর ব্যবস্থা দেখিয়া সত্যই সে মুগ্ধ হইতেছিল; আর সেই সঙ্গে প্রচুর ঐশ্বর্য এবং বিলাসোপ-করণ সত্ত্বেও তাহার দৈন্য যেন সুস্পষ্ট হইয়া জানাইতেছিল যে, এদিক দিয়া কত দরিদ্র সে, সব থাকিতেও কিছুই তাহার নাই, একেবারে নিঃস্ব যেন! হঠাৎ পরিচ্ছন্ন শয্যাটির শিয়রের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতেই প্রিন্সের চোখ দুটি বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।...মুক্তার সেই মালা ছড়াটী একখানি ফটোর গায়ে ঝুলিতেছে না? কোন্ ভাগ্যবানের ঐ প্রতিকৃতি?...তাড়াতাড়ি আগাইয়া গিয়া তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রিন্স দেখিল—ছোট একটী গোল টীপয়ের উপর বাহারি ফ্রেমে বাঁধানো একখানি ফটো একজোড়া ফুলদানির মাঝখানটীতে সযত্নে সংন্যস্ত; উভয় ফুলদানির উপর গোলাপফুলের গুচ্ছ; ফটোর উপরে সকালের সেই মুক্তার মালা ছড়াটী পড়িয়া তাহার ঔজ্জ্বল্য বাড়াইয়া দিয়াছে, নিচেই আইভরি আধারটী খোলা পড়িয়া আছে। অল্প

একটু ঝুঁকিয়া ভ্রূ দুটী কুঞ্চিত করিয়া প্রিন্স ফটোখানির দিকে চাহিতেই বুঝি একটা চাপা আর্তস্বর তাহার কণ্ঠা ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিতে চাহিল!

য়্যা—কে এ? মায়ার না? তার ফটো সোফিয়ার ঘরে—তার শয্যার শিয়রে? সেই মুক্তার মালা—সোফিয়ার গলায় পরাইয়া দিবার জন্য যে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল—মায়ারের গলায় তাহা ঝুলিতেছে! তবে কি···প্রিন্স আর ভাবিতে পারিল না, হাত দুইটী বাড়াইয়া ফুলদানির ভিতর হইতে সন্তর্পণে ফটোখানি মালাশুদ্ধ বাহির করিয়া লইল।

উচ্ছিষ্ট পাত্রগুলি টেবিল হইতে তুলিয়া বারান্দায় রাখিতে গিয়াছিল সোফিয়া; সেই দিকেই বাথরুম। একটু পরে ঘরে ঢুকিয়াই সবিস্ময়ে সে দেখিল পাশের ঘরের দরজায় ফেলা স্ক্রীনটির পাশ কাটাইয়া এ-ঘরে আসিতেছে তাহার সন্ধ্যার সম্মানীয় অতিথি—টিপয়ে রাখা মুক্তার মালা পরানো ফটোখানি দুই হাতে ধরিয়া।

দেখিয়াই সে কাঠ হইয়া দাঁড়াইল। অতিথি যে ভদ্রতা ভুলিয়া তাহার অজ্ঞাতে শয্যা-গৃহে প্রবেশ করিবে ইহা সে ভাবিতেও পারে নাই। চতুর প্রিন্স এক নজরে তাহার মুখভঙ্গি দেখিয়াই মনের বিরাগটুকু ধরিতে পারিল এবং তৎক্ষণাৎ সে-ভাবটি সরাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়া উঠিল: তোমাকে না বলেই ও-ঘরখানায় ঢুকে সত্যিই আমি অন্যায় করেছি সোফিয়া, কিন্তু এ কথাও না বলে পারছি নে, এই দুঃসাহসটুকুর জন্যেই এমন দুষ্প্রাপ্য বস্তুটী আবিষ্কার করে ফেলেছি। বলিতে বলিতে টেবিল-খানির সামনে আসিয়া বড় ফুলদানিটীর গায়ে ফটোখানি হেলাইয়া রাখিয়া প্রিন্স আসন গ্রহণ করিল।

সোফিয়া এতক্ষণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রিন্সের মুখের পানেই চাহিয়াছিল। ফটোখানি এইভাবে রাখিয়া তাহাকে বসিতে দেখিয়া সেও টেবিলটীর

ওপাশে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর মুখখানা শক্ত করিয়াই বলিল: আপনি নিজে এই কষ্টটুকু স্বীকার না করলেও কোন ক্ষতি হত না; আপনার আসল ভুলটা ভাঙবার জন্তে নিজেই আমি ওখানি এনে দেখতাম। কেন জানেন—মুক্তোর যে মালা ছড়াটাকে উপলক্ষ করে আমাদের আলাপ আর, আমার সম্বন্ধে আপনার মনে যে কৌতূহলটুকু জেগেছে, এই ফটো থেকেই সেটা সুস্পষ্ট হবার কথা।

প্রিন্স: জিজ্ঞাসা করতে পারি সোফিয়া, এ লোকটার সঙ্গে তোমার কি সম্বন্ধ?

সোফিয়া: দোকানে যখন এই মালা ছড়াটা আমার গলায় নিজে পরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, কি উত্তর আমি দিয়েছিলুম নিশ্চয়ই মনে আছে আপনার? সেই মালা যখন আমিই ফটোর ঐ মানুষটির গলায় পরিয়ে দিয়েছি, ওঁর সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি সুস্পষ্ট হয়নি মনে করেন?

প্রিন্স: তাহলে তোমারও স্বামী আছে সোফিয়া, আর সেই স্বামী হচ্ছেন ইনি? আমি কিন্তু ভেবেছিলুম, তোমার বিয়েই হয়নি এখনো।

সোফিয়া: আপনার এই ভুলটি ভাঙবার জন্তেই এত আয়োজন আমাকে করতে হয়েছে প্রিন্স।

প্রিন্স: এ ভাবে চোখে আঙুল দিয়ে ভুল ভেঙে দেওয়া তোমার মত মেয়ের পক্ষেই সম্ভব সোফিয়া! কিন্তু এই ব্যক্তির সম্বন্ধে আমি যতদূর জানি·· হ্যাঁ, তার আগে তোমার কাছেই জানতে চাই···ইনি কি মিষ্টার মায়ার নন?

সোফিয়া: হ্যাঁ, এই নামেই ইনি পরিচিত।

প্রিন্স: আশ্চর্য! আমাদের জীবনে কত কথাই চাপা থাকে, জোর করে ঢাকা না খুললে কিছুই টের পাওয়া যায় না!···তোমার কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, কতক্ষণেরই বা পরিচয়! কিন্তু মায়ার···মিঃ মায়ার...

পাঠদ্দশা থেকে যে আমার সাথী, দিনে-রাতে চব্বিশ ঘণ্টার বেশীর ভাগ যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক···তার জীবনে যে কোনদিন বিবাহের বন্ধন পড়েছে · আর, তোমার মতন আদর্শ নারী তার পত্নী···আমি এ সম্পর্কে একেবারেই অন্ধকারে আছি—কিছুই আমাকে সে জানায় নি।

সোফিয়া : আপনার সঙ্গে খুব বেশী ঘনিষ্ঠতা বলেই হয় ত তিনি ইচ্ছা করে এ-ব্যাপারটা চেপে রেখেছিলেন।

প্রিন্স : তিনি চেপে রাখলেও তোমার মতন চৌখষ মেয়ের পক্ষে কি উচিত ছিল না সোফি, অনেক আগে ঢাকাটি খুলে দেওয়া ? তাহলে ত নতুন একটা ভুলের পথে এভাবে পা বাড়িয়ে প্রচণ্ড একটা লজ্জার সঙ্গে ঠোকা-ঠুকি হোত না !

সোফিয়া : লজ্জার সঙ্গে ঠোকাঠুকি ! টাকার জোরে নারীর রূপ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে যাদের একটুও বাধে না—পৃথিবীর কোন লজ্জাকে কোন দিনই তারা দৃকপাতও করে না ; ঠোকাঠুকিও যদি বাধে, এখনকার বিশেষ ধরণের লরীর মতন চাপা দিয়ে চুরমার করে চলে যায়। আপনিই বলুন প্রিন্স, লজ্জার কথা আপনার মুখে সত্যিই সাজে কি ?

প্রিন্স : কড়া হলেও তোমার কথা খুবই সত্যি। কিন্তু এটাও ঠিক যে ঘটনা বিশেষে এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। তোমাকে ভুল বুঝে আমি যে সত্যিই লজ্জা পেয়েছি, এ কথা তুমিও আশা করি, অস্বীকার করবে না ! এখন কিন্তু ভারি একটা মুশকিলে পড়া গেছে তোমার স্বামীকে নিয়ে।

সোফিয়া : পড়বারই কথা। যে ভয়ে তিনি বিবাহের কথা আপনার কাছে চেপে রেখেছিলেন, ভয়ের সেই ঢাকাটি আপনিই স্বহস্তে খুলে দিয়েছেন, এই খবরটি যদি তিনি জানতে পারেন···

প্রিন্স : যদি পারেন নয়—পেরেছেন ! প্যালেস থেকে বেরুবার সময় নিজেই তাকে জানিয়ে ফেলেছি আজকের অভিসারের কথাটা।

সেফিয়া : কি বলছেন আপনি ?

সোফিয়া : অর্থাৎ সব জেনেও না জানার ভাণ করে আপনাকে হাতে-নাতে ধরে একটা বড় রকমের খেসারৎ আদায়ের ষড়যন্ত্র করেছি—এই সত্যটুকুই ত বুঝেছেন আপনি ?

প্রিন্স : বোঝাটা কি খুব স্বাভাবিক নয় সোফিয়া ? এখানে আসবার আগে পর্যন্ত তোমাদের দাম্পত্য-সম্বন্ধ ঘুণাক্ষরেও আমার জানা ছিল না, কিন্তু আমার সম্বন্ধে সব কিছুই তোমরা স্বামি-স্ত্রী জানতে ; আজকের সকালে দোকানের ঘটনার পরও তোমাদের দেখা সাক্ষাৎ হওয়া অসম্ভবও কিছু নয় ; এ-অবস্থায় ঐ ধরণের কোন নীচ সন্দেহই যদি মনে জাগে সেটা কি সত্যিই অসঙ্গত ?

সোফিয়া : সাধারণের পক্ষে হয়ত খুবই সঙ্গত, কিন্তু পাকা জহুরীর মত যিনি নারীর রূপ যাচাই করতে ওস্তাদ, নারীর সাজ-সজ্জা আর চোখের দৃষ্টি দেখে যিনি তার মনের খবর ধরতে চান, তাঁর পক্ষে এটা খুবই অসঙ্গত বৈকি। কিন্তু এর পাল্টা জবাবে আমি যদি বলি - স্বামীর সঙ্গে আমার মিল নেই ; মস্ত একটা ব্যবধান আছে আমাদের মাঝখানে, এমন কি একটি বছর পূর্ণ হতে চললো—আলাপ-আলোচনা ত ঢের দূরের কথা, মুখ-দেখা-দেখি পর্যন্ত বন্ধ—প্রিন্স কি এগুলো বিশ্বাস করবেন ?

প্রিন্স : বলো কি ? এ রোম্যান্সের আর একটা নতুন চ্যাপ্টার সুরু করলে যে! তোমাদের দাম্পত্য জীবনে ব্যবধান, মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ! দোষটা কোন্ পক্ষের ?

সোফিয়া : অদৃষ্টের। সংসার আর গৃহস্থালীর কথা উঠতেই ত আভাসে এ কথা বলেছি আপনাকে। আপনি তখন কথাটা ঠিক ধরতে পারেন নি।

প্রিন্স : নিজের দাম্পত্য জীবনকে লক্ষ্য করেই যে সেই ছড়াটা তুমি পড়েছিলে সেটা সত্যিই বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখনো আমি বুঝতে পারছিনে—তোমার মত মেয়েকে বিবাহ করবার সৌভাগ্য পেয়েও মায়ার অশান্তিকে ডেকে আনলে কেন ?

সোফিয়া : তার কারণ, তিনি ঠিক আমাকে দেখেই বিবাহ করেন নি ; আমার মায়ের ঐশ্বর্যের লোভেই বিবাহ করেছিলেন।

প্রিন্স : কথাটা একটু খুলেই বলো, শুনি।

সোফিয়া : আমার বিয়েটাকে উপলক্ষ করে সেয়ানায় সেয়ানায় কোলাকুলি হয়েছিল আর কি ! ওঁর হরেক রকমের দামী দামী গাড়ী, চৌরঙ্গীর বাড়ী, ইউনিভারসিটির ডিপ্লোমা...এসব দেখে মা'র মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু বিয়ের পর যখন জানা যায় সব ভূয়ো, মা তখন ক্ষেপে ওঠেন।

প্রিন্স : বটে ! আর তুমি ?

সোফিয়া : আমি তখন খুব হেসেছিলাম।

প্রিন্স : শুধুই হেসেছিলে !

সোফিয়া : সেই জন্যেই ত আমার এই অবস্থা আজ। বাপের বাড়ীতে পরের মতন আলাদা থাকি, মায়ের দোকানে চাকরি করি। মা'র মতন ক্ষেপে উঠলে ওঁর অদৃষ্টে হোত জেল, আর আমিও আবার বিয়ে-থা করে এই সম্পত্তির মালিক হতে পারতাম।

প্রিন্স : তুমি বুঝি স্বামীর পক্ষই নিয়েছিলে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ?

সোফিয়া : আপনাদের ঐ সংস্কৃতির ছোঁয়াচ পেয়ে মাথা আমার বিগড়ে গিয়েছিল। ভণ্ড জেনেও স্বামীর দিকেই মন ঝুঁকেছিল। কিন্তু মা তাঁর সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন জেনে স্বামীর মা আমাকে বিষদৃষ্টিতে দেখেন, স্বামীও দূর-ছাই করতে থাকেন। পীড়ন যখন চরমে ওঠে মায়ের কাছেই আবার ফিরে আসতে হয়। বাড়ীর

এই দুটি ঘর নিয়ে আছি, দোকানে চাকরিও পেয়েছি। একটি বছর এই ধারায় জীবন চলেছে, এর মাঝে একটি দিনও দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি স্বামীর সঙ্গে। এই আমার জীবন, প্রিন্স।

প্রিন্স: তোমার জীবন যে দেখছি সত্যিকারের এক রহস্য সোফিয়া তবুও, একটা কথা আমি কিন্তু ভেবে পাচ্ছি না।

সোফিয়া: কথাটাই বলুন না!

প্রিন্স: একটু আগে তুমিই বলেছ—আমার এখানে আসবার খবরটা বেনামা চিঠিতে তোমার স্বামীকে জানানো হ'য়েছে। কিন্তু তোমার সঙ্গে তার মুখ দেখাদেখিই যখন নেই—এখবর তাঁকে জানাবার কারণ? চিঠি যিনিই লিখুন না কেন, তোমাদের সব খবরই নিশ্চয় তিনি জানেন!

সোফিয়া: জানেন বলেই ত তিনি এতটা দুঃসাহসী হয়েছেন-- সামনা-সামনি সবাইকে দাঁড় করিয়ে মুখোশগুলো খুলে দিতে চেয়েছেন।

প্রিন্স: কিন্তু একথা কি তিনি ভেবেছেন—মুখ দেখা দেখি যেখানে বন্ধ, এ চিঠির কোন আকর্ষণই সেখানে নেই?

সোফিয়া: স্বামীদের মনস্তত্ত্বেও তিনি ওয়াকিবহাল। আপনি কি জানেন না—স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যত বড় বিচ্ছেদই হোক না কেন, শুধু সম্পর্কটুকুর জোরে স্ত্রীর সম্বন্ধে স্বামীত্বের অধিকার ষোল আনা বজায় রাখতে চান। এ-অবস্থায় স্বামী যদি কোন অন্যায় অনাচার করে, স্ত্রী বেচারী মুখ বুজিয়ে সয়ে যায়, সমাজও বাধা দেয় না; কিন্তু স্ত্রীর তরফ্ থেকে এমন কিছু হলে আর রক্ষে নেই; স্বামীর মাথায় অমনি খুন চেপে যাবে, সমাজেও ঢি-ঢি রব উঠবে।

প্রিন্স: তাহলে তুমি কি মনে করো—মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলেও আজকের বিশ্রী খবরটা তোমার স্বামীকে টেনে আনবে এখানে?

সোফিয়া: আমার ত তাই মনে হয়।

প্রিন্স : হুঁ ! আচ্ছা, আর একটা কথা আমি জিজ্ঞাসা করবো। বছরখানেক আগে যে-কদিন স্বামীর সংস্রবে তুমি ছিলে, তার মুখে আমার কথা কিছু শোননি ?

সোফিয়া : কিছুই তিনি আমাকে বলেন নি। সেখান থেকে চলে আসবার পরে অল্প কিছুদিন হোল আমার কোন বন্ধুর কাছে আমি তাঁর পেশার খবর পাই। তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবই আমাকে জানতে হয়। আর, কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি ওঁর পেশার সঙ্গে আপনার নেশাটাও···কি বলব ?

গম্ভীর মুখে প্রিন্স বলিল : থাক্, আর বলতে হবে না। আমি বেশ বুঝতে পেরেছি, স্বামী তোমাকে ত্যাগ করলেও তুমি তাকে ত্যাগ করতে পারনি, তারই মুখ চেয়ে নিজের চেষ্টাতেই আমাদের সব খবরই সংগ্রহ করেছিলে। তারপর যখন হাতে-নাতে ধরবার জন্যে উশখুশ করছিলে—ঠিক সেই সময় ঐ মালা ছড়াটি কিনতে গিয়ে তোমার কাজটা হাল্কা করে দিয়েছি—এই আর কি ?

সোফিয়া : কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি আমাদের দোকানে আসবার আগে আর কোন দিন আমি আপনাকে দেখিনি।

প্রিন্স : এখন সেটা সম্ভব বলেই মনে হচ্ছে। সে যাই হোক, তোমার 'প্ল্যান্'টি যে নিখুঁত হয়েছে তাতে কোন সন্দেহই নেই। এখন শেষ রক্ষাটি আমাকেই করতে হবে। সাড়ে আটটা বাজতে এখনো মিনিট সাতেক দেরি ; এখন এই সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করা যাক। ঘরে যখন 'অর্গ্যান' রয়েছে, গানের চর্চা তাহ'লে নিশ্চয়ই হয়। আপত্তি যদি না থাকে গান একখানা শুনিয়ে দাও।

নীরবেই সোফিয়া অর্গানের সামনে টুলটির উপর বসিয়া করুণ সুরে গান ধরিল :

"আমার বুকের গান মানুষের তরে আমি গাই—
সকলের বুকে বুকে আপনারে হারাইতে চাই।
রাখিতে আপন মান, মানুষের রাখিবারে দাম,
মানুষের জয়-গাঁথা গেয়ে গেয়ে ফিরি অবিরাম।
মানুষ-পূজারী আমি, হাতে মোর প্রেমের মালিকা,
আরতি তাহার করি, জ্বালাইয়া প্রাণের বর্তিকা।
প্রণতি নাহিক মোর—গোলামি পূজায় মোর নাই,
বড় যারে মনে হয়, দাদা বলে বুকেতে লুটাই।"

গানটি শেষ করিয়া পুনরায় আথরটি ধরিয়াছে সোফিয়া, এমন সময় বাহিরের দিকের দরজার উপর 'টাঙানো' পরদাখানির পাশ দিয়া তৃতীয় এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইল।

প্রিন্সের সহিত চোখাচোখি হইতেই টুপি খুলিয়া মাথাটি নত করিয়া সে যেমন সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানাইল, প্রিন্সও অমনি সোৎসাহে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সহজভাবেই বলিল: হ্যাল্‌লো মায়ার, এসো! আমরা তোমারই প্রতীক্ষা করছি হে?

প্রিন্সের কথায় চমকিত হইয়া সোফিয়াও এই সময় গান ছাড়িয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনেকদিন পরে স্বামী-স্ত্রীর আবার দৃষ্টি সংযোগ হইল।

বক্র দৃষ্টিতে ইহা লক্ষ্য করিয়া প্রিন্স বলিল: দাঁড়িয়ে রইলে যে, মায়ার বস'—অন্য সম্বন্ধ ভুলে যাও বন্ধু, মনে করো আমি এখানে সাধারণ অতিথি হয়েই এসেছি।...তুমিও বস' সোফিয়া। তোমার স্বামীর সামনে আমাকে এখন কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

টেবিলখানার কাছে আসিয়া চেয়ারটি ধরিয়া প্রসন্ন মুখে মায়ার বলিল: কৈফিয়ৎ কিছুই দিতে হবে না প্রিন্স, আমি সবই শুনেছি।

তীক্ষ্নদৃষ্টি মায়ারের মুখে নিবদ্ধ করিয়া প্রিন্স বলিয়া উঠিল: অ! 'ওভার-হিয়ার' করেছ তাহলে? শুনছ সোফিয়া, বন্ধুর আর তর সয়নি; আগে থাকতে এসে আড়ি পেতে সবই শুনেছেন! এটা বোধ হয় তোমার সেই উড়ো চিঠির ফল!

মুখখানা আরক্ত করিয়া সোফিয়া প্রিন্সের দিকে একটিবার চাহিল, পরক্ষণে দৃষ্টি ফিরাইয়া সামনের অর্গানটির রীডগুলি নাড়িতে লাগিল।

তাহার মুখের ভঙ্গিতে অর্থটুকু উপলব্ধি করিয়া প্রিন্স বলিল: চিঠিখানা তোমার বলেছি এই ভেবে যে—চিঠিখানার রচনা যারই হোক্, ব্যাপারটা তোমার অজানা নয়। যাক সে কথা। হ্যাঁ, তুমি হয় ত আমাদের শেষের কথাগুলো শুনেছ মায়ার, কিন্তু প্রারম্ভটুকুও তোমার জানা দরকার।...আহা, বস' তোমরা; নইলে আমাকেও দাঁড়াতে হয়, আর—উপসংহারটি অসমাপ্ত থেকে যায়।

প্রিন্সের কথায় অগত্যা উভয়কেই বসিতে হইল। কিন্তু সোফিয়া সুরু হইতেই যে সংকোচটুকু কাটাইতে পারিয়াছিল, মায়ারের পক্ষে তাহা দুঃসাধ্য হইল।

প্রিন্স বলিয়া চলিল: মুক্তোর একছড়া মালা কিনতে যাই ম্যাডাম মেরিনার জুয়েলারী শপে। সেখানে সোফিয়ার সঙ্গে হয় পরিচয়। বুঝতেই পারছ, তার পরিণাম কি দাঁড়ায়। মালাছড়াটি কিনে আমি ওঁর গলায় পরিয়ে দিয়ে কি রকম বাহার খোলে সেটা দেখতে চাই। কিন্তু উনি তাতে এই ব'লে আপত্তি তোলেন—মেয়েদের গলায় মালা পরিয়ে দেবার অধিকার সব পুরুষদের থাকে না। কথাটা তখন বুঝতে না পেরে ওঁকেই বলি নিজের হাতে মালাটি গলায় পরতে। সত্যি

বাহার এমনি খোলে যে খুলে নিতে মন বিদ্রোহী হয়ে উঠে। তখন এই কথা হয়—মালাটি উনি পরেই থাকুন, সন্ধ্যার পর নিজে গিয়ে ফিরিয়ে নেব। উনি তাতেই রাজী হয়ে কার্ড বার করবার জন্যে হাত ব্যাগটি খোলেন, কিন্তু বেরিয়ে আসে সেই ফটোখানা। আমি সেইখানিই তুলে নিই ওর অনিচ্ছাতেই।

মৃদু স্বরে মায়ার বলিল: সেই ফটো আপনি আমাকেই দিয়েছিলেন।

প্রিন্স একটু থামিয়া বলিল: এখানে এসেই গৃহসজ্জা আর গৃহস্বামিনীর রূপসজ্জা দেখে চমকে যাই; তারপর আলাপ-আলোচনা আর আতিথেয়তায় বেশ বুঝতে পারি যে, এই প্রথম এমন একটা মেয়ের সংস্পর্শে আসা গেছে—যার জাতটা সত্যিই আলাদা। শেষটায় কি হোল জান? যে মালা ওরই গলায় পরিয়ে দেবার জন্যে মেতে উঠেছিলুম, একটু ফুরসৎ পেয়ে ওরই অজ্ঞাতে ঐ ঘরখানায় গিয়ে দেখি—সেই মালাটি নিজের হাতেই উনি পরিয়েছেন এই ভাগ্যবান মানুষটির গলায়! ·· চিনতে পারছ তুমি মানুষটিকে!

বলিতে বলিতে মুক্তার মালা দ্বারা সাজানো ফটোখানি তুলিয়া প্রিন্স মায়ারের সামনে রাখিল। একটীবার সেদিকে চাহিয়াই মায়ার গাঢ় স্বরে বলিল: আমার জীবনের এই সবচেয়ে 'প্যাথেটিক' দিকটা লুকিয়ে রাখবার জন্যে আমি 'য়্যাপলজি' চাইছি প্রিন্সের কাছে।

গম্ভীর মুখে প্রিন্স বলিল: আমার কাছে নয় মায়ার, 'য়্যাপলজি' তোমার চাওয়া উচিত সোফিয়ার কাছে—যার স্পর্শে এসে আমিও আজ নতুন পথের সন্ধান পেয়েছি, আর পেয়েছি সত্যিকারের দরদী এক ভগিনী। শুধু তাই নয়, আমাদের উভয়ের উচিত ওর কাছে 'য়্যাপলজি' চাওয়া।

ময়ার মুখখানা তেমনই নিচু করিয়া রহিল ; আর সোফিয়া এই সময় মুখখানা তুলিয়া অনুচ্চ কণ্ঠে বলিল : তাহলে বেছে বেছে ঐ গানখানা গাওয়া আমার সত্যিই সার্থক হয়েছে, আমিও পেয়েছি সত্যিকারের এক দাদা !

মুখখানা প্রসন্ন করিয়া প্রিন্স বলিল : সত্যিই, এমন যোগাযোগ যে হবে তা আগে ভাবিনি। ভগিনীর গান যেমন সার্থক হয়েছে, তেমনি দাদার দানটিও সার্থক হোক ঐ মুক্তোর মালাটীকে উপলক্ষ করে। ওকি অমন করে চাইছ যে, 'না' বলবার জোটা আর নেই।

মুখখানা শক্ত করিয়া সোফিয়া বলিল : কিন্তু দেওয়া আর নেওয়া— এ দুটোর ওপরে দাতা ও গৃহীতা দু'পক্ষের শ্রদ্ধা থাকলে তবেই আদান-প্রদান সার্থক হয়ে থাকে। এখন আপনিই বলুন, আপনার ওপরে আমার মনে শ্রদ্ধা জন্মালেও, আপনার দানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করবার মতন অবস্থা সত্যিই এসেছে কি ? তবে যদি বলেন, তাহলে মালাছড়াটী ঐ কুকুরটার গায়ে চড়িয়েছি কেন,– এর উত্তর হচ্ছে— একটা ভুল আপনার ভেঙ্গে দেবার জন্মেই এটা করা হয়েছে। মালাশুদ্ধ ঐ বস্তুটী আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য।

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর প্রিন্স বলিল : তোমার কথা আমি বুঝিছি সোফিয়া। আমাকে শ্রদ্ধা করলেও আমার দানকে তুমি শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিতে পারছ না এই জন্তে যে, দানের সঙ্গে আমার নামের একটা কলঙ্ক জড়িয়ে আছে ; আর পাছে সেই কলঙ্ক তোমাতেও স্পর্শ করে এই তোমার আশঙ্কা। কিন্তু আমার কলঙ্কিত অতীত যদি সত্যিই মুছে ফেলি,—যে নোংরা নেশাটা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছিল, সেটাকে যদি খোলসের মতন ত্যাগ করি, তাহলেও কি তোমার পূর্ণ

শ্রদ্ধা পাবোনা সোফিয়া, তুমি কি ক্ষমা করবে না তোমার এই দুর্ভাগ্য দাদাটীকে ?

প্রিন্সের মর্মস্পর্শী কথায় সোফিয়ার কঠিন মুখখানি কোমল হইয়া আসিল, কণ্ঠস্বর অতিশয় স্নিগ্ধ করিয়া সে উত্তর করিল : আমার শ্রদ্ধা আপনি আগেই পেয়েছেন, এখন দেশের শ্রদ্ধা আপনাকে আদায় করতে হবে দাদা ! বোনটিকে ভালবেসে যে দান আপনি করেছেন, আপনার কথার ওপর নির্ভর করে শ্রদ্ধার সঙ্গেই আমি তা নিচ্ছি. কিন্তু নিজের জন্যে নয়—দুর্গত দেশবাসীর জন্যে। যে বস্তুটি আপনি উপহার দিয়ে একটি মেয়েকে খুশি করতে চেয়েছিলেন, দেশের পাঁচ হাজার আনাথা মেয়ের মুখে হাসি ফোটাবার উপলক্ষ হোক সেই মূল্যবান বস্তুটি।

মনে মনে কি ভাবিয়া প্রিন্স বলিল : তোমার যুক্তির ওপরে আমি আমি আর একটু টিকা জুড়ে দিচ্ছি দিদি, শোনো—যে মালাছড়াটি উপলক্ষ হয়ে এত বড একটা পরিবর্তন ঘটালে—এই দুটো আধুনিক জগাই মাধাইকে উদ্ধার করলে—সেটি স্মরণীয় বস্তুর মতনই তোমার কাছে বরঞ্চ গচ্ছিত থাকুক। আর, দেশের দুর্দিনে দেশবাসীর পানে না চেয়ে যে সব অনাচার করে এসেছি এতদিন, তারও প্রায়শ্চিত্ত চলুক একেই সাক্ষী রেখে। তোমার কাজ হোক দিদি, নারী জাতটাকে বাঁচিয়ে রাখা, তাদের সত্যকার রূপের আলো ফুটিয়ে তোলা—যে আলো উন্মত্ত পতঙ্গগুলোকে পোড়ায় না, পাগলামিটা সারিয়ে দেয়। এর জন্যে অর্থের অভাব হবে না।

আস্তে আস্তে টেবিলখানির কাছে আসিয়া সোফিয়া বলিল : এ কথার পর আর আপত্তি চলে না ত, আমি মেনে নিলুম দাদা। ভবিষ্যতের একটা বড় সম্ভাবনার নিমিত্তের মতই হোক আপনার এই মুক্তার মালা।

কথাগুলি বলিতে বলিতে টেবিলের দিকে ঝুঁকিয়া সে মালা ছড়াটি তাহার স্বামীর কণ্ঠে হইতে খুলিতে লাগিল।

প্রিন্সের দৃষ্টি সোফিয়ার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। এই সময় সে দৃষ্টি প্রখর করিয়া স্নেহের সুরে সে বলিয়া উঠিল: দাদার আর একটি কথা যে রাখতে হচ্ছে বোন!

ফটো হইতে মুক্ত মালা ছড়াটি খুলিয়া ভাঁজিতে ভাঁজিতে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে প্রিন্সের মুখের দিকে চাহিতেই প্রিন্স বলিল: তোমার পরশ পেয়ে ঐ মালাটি পাষণ্ড উদ্ধারের শক্তি যে পেয়েছে, হলফ করে একথা আমি বলতে পারি। এই জগাইকে উদ্ধার যখন করেছ, মাধাই একাটি পড়ে থাকে কেন? তাই অনুরোধ করছি, ভাঁজটি খুলে ঐটি মায়ারের গলায় পরিয়ে দাও দিদি, অনেক দিনের পুরোণো মামলাটারও নিষ্পত্তি হয়ে যাক।

সোফিয়ার মুখখানা পুনরায় কঠিন হইয়া উঠিল, কণ্ঠের স্বরটিও কিঞ্চিৎ রুক্ষ করিয়া সে বলিল: পুরোনো মামলাটির বিচার-কর্তা হলে আপনি কি এইভাবেই বিচার করতেন?

হাসি মুখে উত্তর করিল প্রিন্স: নিশ্চয়ই; এ-সব ব্যাপারে মধ্য যুগের হারুণ-উল-রসিদের মতন আমার বিচার-পদ্ধতি হুবহু মিলে যাবে দিদি! তা ছাড়া, এ যুগের মনস্তত্ত্বের দিক দিয়েও মিলটা যে নিজেই করে ফেলেছ আগে—ছবির গলায় মালাটি চড়িয়ে!

মুখখানা আরক্ত করিয়া সোফিয়া বলিল: যান, আপনাকে আর বিচার করতে হবে না।

সঙ্গে সঙ্গে প্রিন্সও বলিয়া উঠিল: বিচার যে আমার হয়ে গেছে সোফিয়া, শুনবে তার রায়?—যে হেতু স্বামীর ছবিতে মালা পরিয়েছ, স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ তোমার নেই। এ-ছাড়া স্বামী আর তোমার মায়ের মনে যে জন্যে বিরাগ, সেটা নিশ্চিহ্ন করবার ভার যদি বিচারক নেয়, কোন গোল আর থাকে না। শীগগীরই তোমার মা জানতে পারবেন যে,

তার জামাতার বৈভব সম্বন্ধে যে সব কথা তিনি শুনেছিলেন নিছক মিছে নয়। তার নিজস্ব বাড়ী হয়েছে, গাড়ী কিনেছে, ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সও মোটামুটি আছে। এমন জামায়ের গলায় মুক্তার মালা সত্যিই সাজে।

প্রিন্সের কথা শুনিয়া স্বামী-স্ত্রী উভয়েই এক সঙ্গে চমকিয়া উঠিল। মায়ার এতক্ষণ মুখখানা নিচু করিয়া অভিভূতের মতই বসিয়াছিল, প্রিন্সের কথা বুঝি তার চমক ভাঙ্গিয়া দিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল: আপনি কি বলছেন প্রিন্স!

গম্ভীর মুখে প্রিন্স বলিল: আমি যা বলি তা মিছে হয় না, একথা ত তুমি জানো মায়ার! তোমার সম্বন্ধে এসব খবর জানতুম না বলেই অনেক অবিচার করেছি তোমার ওপরে। কিন্তু আর তোমাকে ধরে রাখছিনে মায়ার, আজ থেকেই তোমাকে ছুটি দিচ্ছি!

বিস্ময়ের সুরে মায়ার বলিল: ছুটি।

পূর্ববৎ সহজ ভাবেই প্রিন্স বলিল: হাঁ মায়ার ছুটি, চাকরি তোমাকে আর করতে হবে না। তা বলে মনে কর' না যেন আমি তোমাকে বরখাস্ত করছি। যে জন্যে তুমি আমার প্রাইভেট বিজনেসের সংস্পর্শে এসেছিলে সে-পাট যখন তুলেই দিচ্ছি, তোমাদের আটকে রেখে ত কোন লাভ নেই। তাই ছুটির সঙ্গে এই গ্র্যাচুয়িটি। এটা দেবার ও নেবার অধিকার দুজনেরই আছে, যেহেতু এখানে শ্রদ্ধার অভাব নেই। সোফিয়া, কি বল?

চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া মায়ার প্রিন্সের মুখের পানে নীরবে চাহিয়া রহিল। স্বামীর অসহায় অবস্থাটা উপলব্ধি করিয়া অগত্যা সোফিয়াকে বলিতে হইল: প্রায়শ্চিত্তই বলুন আর মিটমাটই বলুন, টাকায় সব হয় না দাদা, দানের সঙ্গে মনের মিলও চাই। ওঁর গ্র্যাচুয়িটিও আপাতত মুলতবী থাক এই মুক্তোর মালার মতন। ঠিক সময় হলেই উনি চেয়ে নেবেন।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া প্রিন্স বলিল: বুঝেছি, আমাকে এখনো বিশ্বাস করতে পার নি, সোফিয়া।

স্নিগ্ধ স্বরে সোফিয়া বলিল: আত্ম-বিশ্বাসে ভরসা থাকলে কাউকে বিশ্বাস করতে আশঙ্কা হয় না। আপনাকে অনেক অগেই আমি বিশ্বাস করেছি। কিন্তু লোকের বিশ্বাসটুকুও যে এখন প্রয়োজন হয়েছে দাদা!

প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিল: কিন্তু তোমার মা'র বিরাগ কি করে ঘোচাবে? ঘটনাচক্রে যে মিলন-গ্রন্থি পড়লো তোমাদের তুটো ছন্নছাড়া জীবনে, যদি আবার ছিঁড়ে যায়?

মৃদু হাসিয়া দৃঢ়স্বরে সোফিয়া উত্তর দিল: সে ভয় আর নেই দাদা, সব বিরাগ ঘুচে যাবে; এখন-যে, সত্যের আলো পড়েছে; আর, সাক্ষী রয়েছে এই **মুক্তোর মালা**।

গাঢ় স্বরে প্রিন্স বলিল: শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতে গেলে বোন!

তিন

ঘৃতের কারবারে প্রতাপ গাঙ্গুলী সর্ব্বস্বান্ত হইলে, কাশীর সকল সমাজেই বেশ একটু চাঞ্চল্য দেখা গেল। এই ব্যবসায়সূত্রে সুসময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় বাঙ্গালী অ-বাঙ্গালী সকল সমাজেরই সংস্পর্শে আসিয়া নানা অনুষ্ঠানে যে বদান্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাহার উল্লেখ করিয়া গুণগ্রাহিগণ তাঁহার পতনে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইলেন। আবার ব্যবসায়সূত্রে যাঁহারা তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে ঈর্ষা করিতেন, তাঁহারা গাঙ্গুলীমহাশয়ের সর্ব্বস্বনাশে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন।

অথচ গাঙ্গুলী মহাশয় কাশীর সকল সমজেই মিশিতেন, সকল ব্যাপারেই ব্যয়বাহুল্যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাঁহার নির্ম্মল মনটির কোনখানেই অহংকারের ছায়ামাত্র পড়িত না। তথাপি এ দুর্দ্দিনে এ লোকোপবাদ হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন না।

সুসময়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বন্ধুধুরন্ধরদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার মহাশয়। ইনি শুধু টাকার কুমীর ছিলেন না, বুদ্ধিরও ছিলেন মানোয়ারী জাহাজ। গৃহীর অলক্ষ্যে ঊর্ণনাভ যেমন ঘরের চারিধারে জাল পাতে, ইনিও তেমনি গাঙ্গুলী মহাশয়ের অলক্ষ্যে তাঁহার ব্যবসায়টির উপর নিপুণভাবে পাটোয়ারী বুদ্ধির জাল অনেকদিন ধরিয়াই পাতিতেছিলেন। যেদিন গাঙ্গুলী মহাশয় সহসা তাহার সন্ধান পাইলেন, তখন আর মুক্তিলাভের কোন উপায় ছিল না; তিনি সেই দুশ্ছেদ্য জালে জড়াইয়া পড়িলেন এবং অবশেষে ব্যবসায়টি তাঁহার সুহৃদরূপী মজুমদার কুম্ভীর মহাশয়ের জঠরে সমর্পণ করিয়া কোনোরূপে নিষ্কৃতি পাইলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের অকৃত্রিম সুহৃদ ছিল, তাঁহার প্রতিবেশী কাহার, গোয়ালা, জোলা প্রভৃতি অনুন্নত অন্ত্যজ সমাজ। আপদে বিপদে গাঙ্গুলী মহাশয় এই সমাজের সহিত অসঙ্কোচে মিশিতেন, তাহাদের উৎসবে ব্যসনে নিজের পরিবারবর্গকেও দেখাশোনা করিতে পাঠাইতেন। তাঁহার এই সহৃদয়তা ও উদারতা সম্বন্ধে অনেকেই অপ্রকাশ্যে ঘোঁট পাকাইলেও ইন্ধনের অভাবে তাহা সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত হইত না। কেন না, তখন গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুসময়; লোকবল, অর্থবল, মিত্রবল অপরিমেয়। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে তর্জ্জনী তুলিবার সামর্থ্য তাঁহার শত্রুদেরও ছিল না।

গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই বিপদে সর্বাপেক্ষা বেশী ব্যথা দিল তাঁহার গুণমুগ্ধ এই সকল হিন্দুস্থানী কাহার ও গোয়ালা এবং বয়নশিল্প ব্যবসায়ী নিম্নশ্রেণীর মুসলমান জোলাদের নির্মল অন্তরে। তাহারা হাহাকার করিয়া উঠিল। ঘোট বাঁধিয়া তাহারা যেন বিশ্বনাথের সঙ্গেই যুঝিতে চায়—কি অপরাধে এমন পরোপকারী পুণ্যাত্মার সর্বস্ব গেল!

বিশ্বনাথের একি বিচার! দেনার দায়ে গাঙ্গুলী মহাশয়ের সুসজ্জিত বাসভবন ও মূল্যবান আসবাবপত্র নীলামে উঠিলে, ইহাদের অন্তর গভীর মর্মবেদনায় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে—দলে দলে এই শ্রেণীর প্রতিবেশীরা লাঠি হস্তে গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাড়ী ঘিরিয়া দাঁড়াইল। হিন্দুরা বলে: এ দেউল। মুসলমান বলে,: এ আমাদের দারগা;—গাঙ্গুলীবাবুর এ আস্তানা দখল করে কে? ওনার একটি চীজ-সামান যে ছোঁবে, আমরা তার শির নেব। সে কি সঙ্কটসংকুল অবস্থা!

কোতোয়ালীতে খবর গেল—বাঙ্গালীটোলায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অকুস্থলে লাল পাগড়ীর পল্টন ছুটিল। গাঙ্গুলী মহাশয় সমস্ত শুনিয়া তৎক্ষণাৎ দলের চৌধুরীদের ডাকাইয়া অতি কষ্টে নিরস্ত করিলেন। দুর্দিনে যেমন এই গণ-দেবতাদের আসল রূপটি

গাঙ্গুলী মহাশয় দেখিয়া বিস্ময়ানন্দে স্তব্ধ হইলেন, তেমনই তাঁহার বন্ধুরূপী পরম হিতৈষী ভদ্রাসুরদের মুখের মুখোস খুলিতে দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন! গাঙ্গুলী মহাশয়ের মূল্যবান আসবাবগুলি মাটীর দরে "লুট" করিবার জন্ম তাহাদের তখন কি আকুলি-ব্যাকুলি!

সর্বস্ব হারাইয়া প্রতাপ গাঙ্গুলী বাঙ্গালীটোলা হইতে বাসা তুলিয়া বেনিয়া পার্কের ধারে একখানি খোলার ঘরে বাসা পাতিলেন। যে পল্লীতে আসিয়া তিনি আশ্রয় লইলেন, তাহার অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান, দুই চারি ঘর হিন্দুও ছিল; কিন্তু সকলেই প্রায় নিরক্ষর; বৃত্তি তাহাদের কৃষি, কারিগরী বা দিন-মজুরী। দুর্দিনের ঘনান্ধকারে গণ-দেবতাদের যেরূপ খ্যাতি তাঁহার চক্ষুর উপর প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই, তাই চিরপরিচিত বরেণ্য ভদ্রপল্লীর মোহ কাটাইয়া জঘন্য শ্রমিকবস্তির মধ্যেই আশ্রয় লইতে তাঁহার অন্তরে দ্বিধা বা সঙ্কোচের লেশটুকুও দেখা যায় নাই।

ব্যবসায়সূত্রে এই দরিদ্র পল্লীর গোয়ালাদের চৌধুরী ভণ্ডুল শা এবং মুসলমান মিস্ত্রীদের মুরুব্বী আবদুল খাঁ গাঙ্গুলী মহাশয়ের বিশেষ অনুগত ছিল। ইহাদের সহায়তায় তিনি বাসস্থান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অপরিচিত পল্লীতে নূতন বাসায় আসিয়া কোন বিষয়েই যে তাঁহাকে অসুবিধা ভোগ করিতে হয় নাই, তাহার মূলেও ইহাদের আন্তরিক চেষ্টা, যত্ন ও সহযোগিতা। ফলতঃ, গাঙ্গুলী মহাশয়ের মত বিশিষ্ট ব্যবসায়ীকে এভাবে অসংকোচে দারিদ্র্যকে বরণ করিতে দেখিয়া, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী অ-বাঙালী ব্যবসায়ীদের চিত্তও বেদনায় ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং গুণমুগ্ধ প্রকৃত সুহৃদ্‌গণ যাঁহারা অন্তরঙ্গরূপে না মিশিয়াও তফাতে থাকিয়াই বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতেন, তাঁহারা প্রতাপ গাঙ্গুলীর এই শোচনীয় পরিণামে হায় হায় করিয়া উঠিলেন। খোলার ঘরে আসিয়া

তাঁহাদের অনেকেই সমবেদনা জানাইয়া গেলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় এতদিনে এই 'আড়-আড় ছাড়-ছাড় ভাবাপন্ন' বন্ধুদের চিনিলেন।

আবার বিশ্বনিন্দুক যাহারা, তাহারা গাঙ্গুলী মহাশয়ের এই নূতন বাসা নির্বাচনের ছিদ্র ধরিয়া তখনও সোৎসাহে যত্রতত্র বলিয়া বেড়াইতেছিল,—'যে যা চায়, সে তা পায়, গাঙ্গুলীরও হ'ল শেষে তাই! একেবারে ভাট-পাড়ায় গিয়ে বাসা বেঁধেছেন! যাদুধন শীগগীরই এর পরে মজা টের পাবেন,- তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি ডাক ছাড়তে হবে!" ফলতঃ পাড়ায় বসিয়া এই বিখ্যাত বাঙ্গালী পরিবারটির দুর্দশাপন্ন জীবনযাত্রাটা দেখিবার সুযোগটি দূরে সরিয়া গেল—বাঙ্গালীটোলার অধিকাংশ বাঙ্গালীর মনস্তাপের মূল তথ্যটুকু ইহাই!

প্রথম প্রথম খোলার ঘরে গাঙ্গুলী মহাশয় এবং চিরসুখে প্রতিপালিত তাঁহার পরিবারবর্গের কষ্ট যে মর্মান্তিক হইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ কি! কিন্তু অসাধারণ ধৈর্যশীল গৃহস্বামী এবং তাঁহার আদর্শ সহধর্মিণী নারায়ণীর ঐশ্বর্যে যেমন বিলাস ছিল না, দারিদ্র্যেও তেমনই বিরাগ আসে নাই। তবে ছেলেমেয়েগুলি ত কোনদিন দুঃখের মুখ দেখে নাই, দারিদ্র্য যে কি, তাহার পরিচয়ও কখনও পায় নাই। তাহারা জানে, খোলার ঘরে যাহারা থাকে, তাহারা গরীব, তাহারা ভাল জিনিষ খাইতে পায় না। তাহাদের ছেলে-মেয়েরা ভাল কাপড়-জামা পরে না। তাই তাহাদের মা-বাপ পার্বণের সময় পাড়ার গরীবদের ভাল করিয়া খাওয়াইতেন, ছেলে-মেয়েদের কত কি পোষাক দিতেন!—শেষে যখন তাহারাই বাপ-মা'র সঙ্গে খোলার ঘরে আসিয়া উঠিল, তাহাদের দামী জিনিষগুলি অপরে লইয়া গেল,—শুধু কিছু কাপড়-চোপড়, বিছানা আর খানকতক বাসন তাহাদের ঘরে আসিল তখন তাহারা নিজেরাই পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল "আমাদের কি হয়েছে ভাই?"—যেটি বয়সে একটু বড়, সে সুন্দর

মুখখানি ম্লান করিয়া বলিল,—"জানিস্ না, আমরা যে এখন গরীব হয়ে গেছি, তাই না খোলার ঘরে এসে উঠেছি।" শুনিয়া সবারই মুখ শুকাইয়া গেল। মনে মনে সকলেই ভাবিল—"কেন আমরা গরীব হয়ে গেলুম? আমাদের সে বাড়ী কি হ'ল! অত লোকজন, গাড়ীঘোড়া, তারা সব কোথায় গেল?"— খেলিতে গিয়া খেলার উপযুক্ত জায়গা না পাইয়া ছেলেরা বাবার কাছে আসিয়া নালিশ করিল, "আমরা কোথায় খেলব, বাবা! এ বাড়ীতে না আছে ছাদ, না আছে দালান, উঠান পর্যন্ত নেই—কি ক'রে খেলি বলত?" গাঙ্গুলী মহাশয় শিশুদের বুকে টানিয়া লইয়া বলিলেন,—"কেন বাবা, সামনে অত বড় মাঠ রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না?—ঐখানে গিয়ে খেলবে তোমরা।" উল্লাসভরে ছেলেরা বলিল,—"ও ত কোম্পানীর বাগান বাবা—ওখানে গিয়ে খেলব আমরা?" পিতার সম্মতি পাইয়া আনন্দে করতালি দিয়া কোলাহল করিতে করিতে তাহারা ছুটিয়া গেল। মুগ্ধনয়নে সেই দিকে গাঙ্গুলী মহাশয় চাহিয়া রহিলেন—অতীতের কত স্মৃতিই তাঁহার মানসপটে তখন ছায়াচিত্রের মত রূপায়িত হইয়া তাঁহাকে অভিভূত করিতেছিল।

গাঙ্গুলীর সর্বস্ব গ্রাস করিয়াও টাঁকার কুমীর প্রাণকৃষ্ণ মজুমদারের মনস্কামনা সিদ্ধ হয় নাই। জীবনসংগ্রামে ক্ষত-বিক্ষত, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে দলিতদেহ প্রতাপ গাঙ্গুলীর শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাইয়াও মজুমদারের মনে কিছুমাত্র সহানুভূতি আসে নাই—বরং গাঙ্গুলী পরিবারের ওপর তাঁহার আক্রোশ ও বিদ্বেষ উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছিল।

গাঙ্গুলীর সর্বস্ব গ্রাস করিবার পর মজুমদার দেখিলেন, গাঙ্গুলীর গুণমুগ্ধের দল তাঁহাকে একরকম 'বয়কট' করিয়া বসিয়াছে। গাঙ্গুলীর যাহারা শত্রু ছিল বা যাহারা কারণে অকারণে গাঙ্গুলীর নিন্দা করিত, তাহারাও এখন মজুমদারের নিন্দায় শতমুখ হইয়াছে। গাঙ্গুলীর মৃতের

কারবারটি আশ্রয় করিয়া অনেকগুলি লোক অন্নসংস্থান করিতেছিল। মজুমদার সেই কারবারের মালিক হইয়াই পুরাতন কর্মীদিগকে বরখাস্ত করিয়া ছেলে ও বাড়ীর একটি চাকরকে লইয়া কারবার চালাইতে ছিলেন। নিন্দুকরা দোকানের সম্মুখে আসিয়াই বলিতে লাগিল,—"ধর্ম সহিবে না মজুমদার, এটা মনে রেখ। দাতা ভোক্তা ব্রাহ্মণকে পথে বসিয়েছ,—এ শুধু প্রতাপ গাঙ্গুলীর টাট নয়,—তার ব্রহ্মরক্ত এখানে আছে। সহ্য হবে না বাবা!" মজুমদার ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া পুলিশ ডাকিয়া নিন্দুকদের তাড়াইবার চেষ্টা করিলে এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটি তাহাতে আরও প্রবল হইবার সুযোগ পাইল। ইহার ফলে, মজুমদারের নিষ্ফল আক্রোশ নিরীহ নিরপরাধ নিত্য অভাবগ্রস্ত গাঙ্গুলীর বিরুদ্ধেই পুঞ্জীভূত হইতে লাগিল। শুধু গাঙ্গুলী কেন, তাঁহার পরিবারবর্গ পর্যন্ত মজুমদারের আক্রোশের 'হেতু' হইয়া পড়িল, এবং ইহার মূলতত্ত্বটুকু আবিষ্কার করিতে গেলে, গাঙ্গুলী মহাশয়ের সহধর্মিণী নারায়ণীর প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। আমাদের সমাজে অধিকাংশ মেয়েরই মনে একটা বড় রকমের দুর্বলতা দেখা যায়। এই দুর্বলতাটুকু নানাভাবেই তাঁহাদের মনের ভাবধারাকে সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। এই দুর্বলতা আর কিছুই নহে, চক্ষু লজ্জা বা উচিত কথা বলিতে কুণ্ঠা। নারায়ণীর এই দুর্বলতা মোটেই ছিল না স্পষ্ট কথা শুনিতে সে যেমন ভালবাসিত, প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে অনুচিত হইলেও তেমনই স্পষ্ট উচিত কথা শুনাইতে লজ্জা পাইত না, এবং তজ্জন্য স্থানকাল বা পাত্রপাত্রীর দিকে দৃক্‌পাতও করিত না। বিদ্যার অতিবিদ্যা যেমন গুণ হইয়াও দোষে দাঁড়াইয়াছিল, নারায়ণীর এই স্পষ্টবাদিতাও শেষে তাহার পক্ষে একটা রূঢ় অপবাদের মত কাহারও কাহারও কাছে আলোচনার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। নানাজনে নানাভাবে তাহার আলোচনা করিত. কেহ বলিত অহঙ্কার, কাহারো মতে তেজ, কেহ কেহ

বলিত—ওটা বড়মানুষী চাল। এই রকম নানাজনে নানাকথা বলিত, কথাগুলি অলঙ্কৃত হইয়া নারায়ণীর কানেও উঠিত, কিন্তু স্পষ্ট কথা শুনাইতে যেমন সে দৃক্‌পাত করিত না, তাহার অসাক্ষাতে তাহার সম্বন্ধে আলোচনাও তেমনই গ্রাহ্যের মধ্যে আনিত না।

একবার কাশিমপুরের রাজনন্দিনী মেয়েদের একটি প্রীতিভোজ দেন। অনেকেই তাহাতে নিমন্ত্রিতা হন এবং রাজনন্দিনী স্বয়ং বাঙ্গালীটোলার বাড়ী বাড়ী গিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া আসেন। নারায়ণী রাজবাড়ীতে গিয়া দেখিল, লম্বা দরদালানে মেয়েদের খাইবার জায়গা হইয়াছে, দুই সারির সমস্ত আসনে মেয়েরা বসিয়া পড়িয়াছে, স্থানাভাবে দশবারটি মেয়ে হলঘরের দ্বারটির কাছে দাঁড়াইয়া আছে, আর কাশীর সবচিন্ একটি অতিশয় মুখরা ও প্রখরা প্রৌঢ়া নারী সেই দ্বারটি আগুলিয়া তখন বলিতেছিল: একটু দাঁড়াও বাছারা, ওদিকের দালানে তোমাদের পাতা হচ্ছে।

নারায়ণীকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়াটি তাহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া হলের মধ্যে যাইবার পথ দিল। ভিতরে গিয়া নারায়ণী দেখিল, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েদের জন্ত সেখানে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা হইয়াছে, রাজনন্দিনী স্বয়ং যত্ন করিয়া তাহাদের বসাইতেছেন। নারায়ণীও সেই যত্ন হইতে বঞ্চিত হইল না।

কিন্তু আসনে বসিয়া নারায়ণী যখন দেখিল, সেঘরে অনেকগুলি আসন খালি থাকা সত্ত্বেও, বাহিরে অতগুলি মেয়েকে বৃথা দাঁড় করাইয়া রাখা হইয়াছে এবং দরজায় কড়া পাহারার ব্যবস্থা,—তখন নিমন্ত্রিতাদের মধ্যে

যে একটা রীতিমত পার্থক্যের সৃষ্টি করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বিলম্ব তাহার হইল না। অথচ সে দেখিয়াছিল, বাহিরে যাহারা দাঁড়াইয়া আছে, গরীব হইলেও, তাহাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েও কয়েকজন রহিয়াছে। তাহাদের মানসিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া নারায়ণী তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উঠিয়া পড়িল। রাজনন্দিনী ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন: কি হ'ল ভাই, আপনি উঠছেন কেন?

নারায়ণী হাসিয়া বলিল: উঠছি এই ভেবে রাজনন্দিনী, এ ঘরের জায়গা যখন শুধু বড়লোকের মেয়েদের জন্যে, আর বাইরের দালানে গরীবদের, তখন আমাকেও ওইখানে গিয়ে বস্‌তে হবে, কেন না আমিও গরীবের মেয়ে।

ঘরশুদ্ধ সমস্ত মেয়ে একেবারে স্তব্ধ! রাজনন্দিনী অপ্রতিভের মত হইয়া বলিলেন: আমি ত পার্থক্যের কোন ব্যবস্থা করিনি, সকলকেই আমি নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি, সবাই আমার কাছে সমান।"

নারায়ণী তাহার বড় বড় উজ্জ্বল চক্ষুদুটি রাজকন্যার নিষ্প্রভ চক্ষুর উপর তুলিয়া অসঙ্কোচে বলিল: আপনার এ কথা শুনে যেমন আনন্দ পাচ্ছি, কাজের ব্যবস্থা দেখে তেমনই লজ্জা আসছে। আপনি নিজে বাড়ী বাড়ী গিয়ে নিমন্ত্রণ করেছেন বলে আমরা সকলেই এসেছি, কিন্তু বাড়ীতে ডেকে এনে এ অপমান করা কেন? সবাই আপনার কাছে যদি সমান, ঘরের বাইরে ওঁরা জায়গা না পেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন কেন, অথচ এ ঘরে এতগুলো আসন খালি পড়ে রয়েছে?

দুই চক্ষু নত করিয়া অপরাধিনীর মত রাজনন্দিনী নারায়ণীর দুটী হাত ধরিয়া বলিলেন: সত্যই আমার অপরাধ হয়েছে দিদি, আমাকে ক্ষমা করুন, আপনি বসুন, আমি নিজে ওঁদের এই ঘরে এনে বসাচ্ছি।

বাহিরে যে মেয়েগুলি দাঁড়াইয়াছিল, রাজনন্দিনী যত্ন করিয়া তাহাদিগকে ভিতরে আনিয়া বসাইয়া দিলেন। নিজের ভুল বুঝিয়া ভয়ে ভয়ে রাজনন্দিনী খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত ঘরে বাহিরে সমানভাবে নিমন্ত্রিতাদের পরিচর্যা করিয়াছিলেন। চক্ষুলজ্জা ত্যাগ করিয়া এই যে দশের মাঝে উচিত কথা বলা, ইহা উপযুক্ত হইলেও, কতকগুলি মেয়ে নারায়ণীর এই কার্যটিকে একটা কেলেঙ্কারী করা বলিয়া পরে অপবাদ দিয়াছিল। সৌভাগ্য-জীবনে দশের মাঝে অসঙ্কোচে এইভাবে উচিত কথা শুনাইয়া নারায়ণী অনেকেরই অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

নারায়ণীর এই সব ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে যাহারা ঘোঁট পাকাইত, মজুমদার গৃহিণী নিরুপমাই ছিল তাহাদের মধ্যে প্রধান। নিরুপমা ধনীর একমাত্র কন্যা, এবং তাহাকে বিবাহ করিয়াই যে প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার 'টাকার কুমীর' হইয়াছেন, এ কথা সাধারণে বিদিত ছিল, নিরুপমাও তজ্জন্য মনে মনে গর্ব পোষণ করিত। নিরুপমার রূপ ছিল, শিক্ষা ছিল, মেয়ে মহলে মিশিবার ক্ষমতা ছিল, আর পয়সা ত তাহার ছিলই,—তবুও সকল বিষয়েই সে যেন নিজেকে নারায়ণীর তুলনায় অনেক নিচুতে মনে করিয়া ঈর্ষায় জ্বলিত। মেয়েদের সভায় দশজনের মাঝে গিয়া দেখিয়াছে, নারায়ণীর স্থান সবার আগে—শ্রেষ্ঠস্থানটি যেনো তাহারই একচেটে; নানা কারণে সকলেরই দৃষ্টি তাহার উপরে পড়ে। নারায়ণী কথনও সত্যাগ্রহীদের দলে মিশে নাই, পিকেটিং করিতে বাহির হয় নাই, কোনও সভায় গিয়া বক্তৃতাও দেয় নাই, অথচ ইহাদের মধ্যেও নারায়ণীর প্রভাব বড় সামান্য নহে।

নিরুপমা একটু ঘটা করিয়াই ছেলের অন্নপ্রাশন দিয়াছিল। উৎসবের দিন দেউড়ীতে দুইদল নহবৎ বসায়। দিনে পুরুষদের ও রাত্রিকালে মেয়েদের প্রীতিভোজের ব্যবস্থা হয়। নারায়ণী ছেলে-মেয়েদের লইয়া যখন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে আসিল, তখন ছাদের উপর মেয়েদের খাওয়া আরম্ভ হইয়াছে। নিরুপমা তাড়াতাড়ি নারায়ণী ও তাহার ছেলে মেয়েদের যত্ন করিয়া ঘরে বসাইল। বলিতে লাগিল: "দেরী ক'রে এসেছ দিদি, কত কষ্ট হবে হয়ত ?

নারায়ণী হাসিয়া উত্তর দিল: আমি ত পর নই ভাই, আমার জন্য ব্যস্ত হয়ো না, তবে ছেলেদের ক্ষিদে পেয়েছে, দালানের ঐ চাতালে ওদের বরং বসিয়ে দাও।

নিরুপমা তাহার ব্যবস্থা করিতে ছুটিয়া গেল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে নারায়ণী ও তাহার ছেলে-মেয়েদের পাতাগুলি পরিপূর্ণরূপে সাজাইয়া বসিবার জন্য ডাকিতে আসিল। নারায়ণী একটি গিনি দিয়া নিরুপমার ছেলেটিকে আশীর্বাদ করিয়া ছেলে মেয়েদের সহিত বাহিরের চাতালে আসিল। পাতে বসিয়াই নারায়ণী দেখিতে পাইল, একটি মলিনবসনা বিধবা দুটি ছোট ছোট ছেলের হাত ধরিয়া উঠানের একধারে ঠিক তাহার সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছে। নারায়ণী নিরুপমার দিকে চাহিল। নিরুপমা রূঢ়স্বরে বলিয়া উঠিল: তোমরা এখানে কে গা ?

মেয়েটি অতি করুণস্বরে বলিল: আমরা গনেশমহল্লা থেকে আসছি মা, আপনার ছেলের ভাতে খুব ঘটা হয়েছে শুনে, আমার ছেলে দুটিকে এনেছি মা,—এদের হাতে দুখানা ক'রে যদি লুচি দাও মা—অনাথা হলেও আমি মা ব্রাহ্মণের মেয়ে—

আগুনের উপর কে যেন ঘি ঢালিয়া দিল। বাড়ীর উঠানে ইহাদের দেখিয়াই নিরুপমা জ্বলিয়াছিল, কথা শুনিয়া রাগ তাহার সপ্তমে চড়িল;

তর্জন করিয়া বলিল: আস্পর্দ্ধা ত তোমার কম নয় বাছা, একেবারে বাড়ীর ভেতর চ'ড়ে এসেছ! লোকজন সব করছে কি বাইরে—একটু নজর রাখে না কেউ! যাও এখান থেকে, বেরিয়ে যাও—

অভাগিনী যেন মাটীর সঙ্গে মিশিয়া গেল লজ্জায় ও অপমানে; আর তাহার ক্ষুধাতুর ছেলে দুটির লোলুপদৃষ্টি নারায়ণী ও তাহার ছেলে-মেয়েদের লুচি ও অন্যান্য লোভনীয় খাদ্য সাজানো পাতাগুলির উপর পড়িয়াছিল!—সে দৃশ্য দেখিয়া নারায়ণীর নারী-হৃদয় আর্ত্ত হইয়া উঠিল। স্থান-কাল পাত্র ভুলিয়া নিজের সাজান পাতখানি আস্তে আস্তে তুলিয়া বিধবাকে বলিল: ধরত মা, আচলখানা না হয় পাত।

বিধবা অবাক্ হইয়া হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, তাহার নড়িবার সামর্থ্য-টুকুও বুঝি সে হারাইয়া ফেলিয়াছিল। নারায়ণী তখন নিজে উঠিয়া তাহার আঁচলখানি টানিয়া খাবারগুলি বাঁধিয়া দিতে দিতে গাঢ়স্বরে বলিল: যাও মা, বাড়ীতে গিয়ে ছেলে দুটিকে খাওয়াওগে! অপমানের সকল জ্বালা ভুলিয়া— দুটি বিস্ফারিত নেত্রে নারায়ণীর উজ্জল মুখখানির দিকে চাহিতে চাহিতে ছেলে দুটির হাত ধরিয়া বিধবা চলিয়া গেল।

নিরুপমা তখন কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহারা চলিয়া গেলে সে একটু অস্বাভাবিক স্বরেই বলিল: কাজটা কি রকম হ'লো দিদি?

সহজ সুরেই নারায়ণী উত্তর দিল: তোমার ছেলেরই কল্যাণ করা হ'ল, দিদি, ভগবান্ নিজের হাতে ত খান্ না, গরীবের ছেলেদের মুখেই তিনি খান। খোকার অন্নপ্রাশন এইখানেই সার্থক হ'ল দিদি।

নিরুপমা একটু উষ্ণ হইয়াই বলিল: গরীবের ছেলেদের মুখে দেবার মত সামর্থ্য যদি আমার নাই থাকে?

নারায়ণী হাসিয়া উত্তর দিল: তাহ'লে এত ঘটা ক'রে দরজায় জোড়া নহবৎ বসিয়েছ কেন, দিদি! আমরা পাড়াগাঁয়ের মেয়ে হলেও ছেলেবেলা

থেকেই শুনে এসেছি, কাজকর্মে ন'বৎ বসালে বা সামাজিক দিলে, আহূত-অনাহূত সকলকেই পেটপুরে খেতে দিতে হয় আগে—কাউকে ফেরাতে নেই।

অন্তরের অসহ্য ক্রোধ কোন রকমে দমন করিয়া, কথার উপর আর কথা না বাড়াইয়া, নিরুপমা বলিল : আমি যে ওদের খেতে দিতুম না, তা নয়, তবে একেবারে লোকের খাবার মুখের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল বলেই —সে যাহোক, তুমি ভালই করেছ বোন্, তোমার খাবার এনে দিই, তুমি খেতে ব'স,—ছেলেরাও হাত গুটিয়ে বসে আছে!

ছেলেমেয়েরা মায়ের প্রকৃতি চিনিত। অমন ব্যাপারটি দেখিয়া তাহারা খাবারের একটি কণাও মুখে তুলে নাই; মা'র মুখখানির দিকে চাহিয়া চুপটি করিয়া সকলেই বসিয়াছিল।

নারায়ণী বাধা দিয়া হাসিয়া বলিল : ছেলেদের আমি ব'সে ব'সে খাওয়াচ্ছি দিদি, আমার জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না; আমার খাওয়া হয়ে গেছে।

অবাক্ হইয়া নিরুপমা বলিল : সেকি, আমার ওপর রাগ ক'রে না খেয়েই চ'লে যাবে তুমি?

নারায়ণী স্থির দৃষ্টিতে নিরুপমার মুখের দিকে একটিবার চাহিয়াই ছেলেদের পাতার লুচি ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে বলিল : রাগের কথা ত হয়নি দিদি,— রাগ যদি করতুম, ছেলেদের খাওয়াতে বসতুম না তাহ'লে।

নিরুপমা বলিল : তুমি ত অভুক্ত আমার বাড়ী থেকে যাবে, তাতে অকল্যাণ আমার হবে না?

আবার পূর্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া নারায়ণী উত্তর দিল : কল্যাণ তোমার পূর্ণভাবেই হয়ে গেছে দিদি, অকল্যাণের কথা মুখেও এনোনা। আর আমার খাবার কথা যদি বল, সেই মেয়েটির আঁচলে আমার পাতের

সমস্ত খাবার বেঁধে দেবার সময় পেট আমার ভরে গেছে। নিমন্ত্রণ থেকে এসে এমন তৃপ্তি আমি আর কখনো পাই নি। দোহাই তোমার, রাগ ক'রনা আমার ওপর,—খাবার জন্য আর বলনা লক্ষীটি!—আমি বরং আর একদিন এসে তোমার পাতে ব'সে একসঙ্গে খেয়ে যাব।

নিরুপমা নারায়ণীকে খাইবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না বটে, কিন্তু এ দিনের এই ঘটনাটি হাড়ের মত তাহার বুকের ভিতর ফুটিয়া রহিল। মনে মনে সেই রাত্রিতেই সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এ অপমানের প্রতিশোধ সে একদিন লইবেই।

তাই গাঙ্গুলী পরিবারের অবস্থা পরিবর্তনে সকলেই যখন তাহাদের দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিত, নিরুপমার মনে তখন বহুদিন পূর্বের সেই অপমানের কাঁটাটি খোঁচা দিয়া তাহাকে সমস্ত কথাই স্মরণ করাইয়া দিত—আর সে তখন সেই অপমানবিদ্ধ অন্তরে উন্মাদিনীর মত কল্পনা করিত—নারায়ণী যেনো সেই মলিন-বসনা বিধবাটির মত শিশু-পুত্রদের হাত ধরিয়া একমুষ্টি অন্নের জন্য তাহাদের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার সেই স্থির সৌদামিনীর মত উজ্জ্বল দৃষ্টি দারিদ্র্যের সংঘাতে নিষ্প্রভ, মলিন,অশ্রুমুখী ; অনাহারে অবসন্ন তাহার ছেলেমেয়েগুলির—দু' টি ভাতের জন্য কি আকুলি-ব্যাকুলি! আর সে তখন...উত্তেজনার উল্লাসে নিরুপমার কল্পনা ভাঙ্গিয়া যাইত! সেই ভিখারিণী প্রতিদ্বন্দ্বিনী আর তাহার শিশুদের লইয়া সে তখন কি করিবে—তাহা আর স্থির করিয়া উঠিতে পারিত না!

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মজুমদার ছিলেন বুদ্ধির জাহাজ বিশেষ। স্ত্রীর প্রকৃতি তিনি খুব ভালভাবেই চিনিয়াছিলেন। তাঁহার সংসারে নামেমাত্র প্রভু যদিও তিনি ছিলেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রভুত্বের রাশটি যে নিরুপমা টানিয়া রাখিত, তাহা কাহারও অবিদিত ছিল না। নিরুপমাকে চটাইয়া বা তাহার সম্মতি না লইয়া কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা

মজুমদারের কল্পনারও অতীত,—বরং স্ত্রীকে খুসী করিবার মত উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিলে তাঁহার উল্লাসের সীমা থাকিত না। স্ত্রীর অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই, গাঙ্গুলী পরিবারের উপর তাঁহার আক্রোশের উপসম কিছুতেই হয় নাই বরং তাহা তাহাদের দুরবস্থার সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়াই চলিয়াছিল। মজুমদার যেদিন স্ত্রীকে অতিমাত্রায় প্রসন্ন করিবার জন্য বলিয়াছিলেন: তুমি দেখে নিও নিরু, গাঙ্গুলীর বউকে রাঁধুনী রেখে যদি তোমার ভাত না রাঁধাতে পারি, তাহলে আমি প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার নই!

সেদিন নিরুপমা যে মধুরদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়াছিল, প্রথম বিবাহ-জীবনের পর, পত্নীর চক্ষু দু-টিতে এত মাধুর্য মজুমদার এ পর্যন্ত আর দেখিবার সৌভাগ্য পান নাই! শুধু তাই নয়, সেইদিনই নিরুপমা লোহার সিন্দুক খুলিয়া পাঁচ হাজার টাকার একখানি কাগজ এনডোর্স করিয়া স্বামীর হাতে দিয়া গদগদ্ স্বরে বলিয়াছিল: কারবারের জন্য ক'দিন ধরেই চাইছিলে না? দিচ্ছি, নাও, বুঝে খরচ ক'র, আর—

সর্বস্বের মালিক ছিলেন যদিও মজুমদার, কিন্তু তাঁহার চাবিটি ঝুলিত নিরুপমার অঞ্চলে। ঘিয়ের কারবার বাড়াইবার জন্য একটি মাস সাধ্য-সাধনা করিয়াও মজুমদার যাহা আদায় করিতে পারেন নাই, স্ত্রীর প্রকৃতি বুঝিয়া একটি চালেই তাহা অনয়াসে সিদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন।

দুর্দশাপন্ন হইলেও গাঙ্গুলী পরিবারের দিনগুলি কোনও রকমে চলিতেছিল, অভাবের সহিত অভাবগ্রস্তের সাথী আধিব্যাধি আসিয়াও এই পরিবারকে মুহ্যমান করিতে পারে নাই। ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হইলে,

গাঙ্গুলী মহাশয় স্বয়ং বিশ্বনাথের চরণামৃত আনিয়া অখণ্ড বিশ্বাসে রোগীকে পান করাইতেন; বলিতেন: সুদিনে অসুখ-বিসুখ এলে ঘটা করে চিকিৎসা চালিয়েছি, দুর্দিনে দীননাথই ভরসা, তাঁর চরণামৃতই মহৌষধি। রোগীও পরম বিশ্বাসে এই পরমৌষধ সেবন করিত,—ব্যাধির প্রকোপ দূরে পলাইত। সুসময়ে অবসরকালে জ্যোতিষের আলোচনা গাঙ্গুলী মহাশয়ের বাতিকের মত দাঁড়াইয়াছিল,—অনেকেই তাঁহাকে কোষ্ঠী দেখাইতে আসিত, তাঁহার গণনার ফল নাকি সর্বত্রই অভ্রান্ত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। গণনার ফল যাহাই হোক, বেগারের ফল ক্রমশঃই বেনো গণককে অবনতির পথে নামাইয়াছিল। আবার অদৃষ্টের এমনই বিচিত্র গতি যে, দুর্দিনের সেই বেগারই এই বিপন্ন পরিবারের অন্নসংস্থানের অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল। সখের এই নির্মল বিদ্যাটির সহায়তায় জীবিকার সংস্থান করিতে তাঁহার বুকে ব্যথা বাজিলেও, অভাবের মসীময় মূর্তি ভীতিপ্রদ হইয়া সকল সঙ্কোচ সরাইয়া দিত।

নারায়ণী সেদিন স্বামীর জ্যোতিষ চর্চার ছোট ঘরখানির ভিতর ঢুকিয়া হঠাৎ বলিল: অনেকের অদৃষ্টই ত গণনা করেছ, 'একবার আমার হাতখানি দেখ দেখি।

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন: হঠাৎ এ সখ হ'ল যে তোমার?

নারায়ণী হাসিয়া বলিল: কাল বড় এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি, শুনবে?

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: স্বপ্নে ত তুমি নিত্যই গঙ্গাস্নান কর শুনতে পাই, এবার বুঝি সমুদ্রস্নানের স্বপ্ন দেখেছ?

গম্ভীর হইয়া নারায়ণী বলিল: না গো, তা কেন? শোন না বলি, কালরাত্রে স্বপ্ন দেখলুম, যেন আমাদের সেই বাড়ীতে ফিরে গেছি; সেই খাট, সেই বিছানা, সেই লোকজন, সেই সব! বলনা, কেন এমন স্বপ্ন দেখলুম? এর ফল কি রকম—

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পরক্ষণে জোর করিয়া হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: মা অন্নপূর্ণার মায়া! স্বপ্নে নিত্য গঙ্গাস্নান ক'রে খুব শুচি হয়ে গেছ কিনা, তাই তোমাকে তিনি ঐশ্বর্যের ছায়া দেখিয়েছেন; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, এই খোলার ঘরখানি থেকেও আমাদের সংসারটুকু তুলতে না হয়।

বিস্মিতভাবে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল: তার মানে?

হঠাৎ নারায়ণীর হাতখানি টানিয়া লইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় ব্যগ্র ভাবে বলিলেন: দেখি তোমার হাতখানা।

নিবিষ্টভাবে তিনি নারায়ণীর হাতের রেখাগুলি দেখিতে লাগিলেন, আর সে সংশয়াকুলচিত্তে স্বামীর গম্ভীর মুখখানির দিকে চাহিয়া রহিল।

হাতের রেখাগুলি পরীক্ষা করিয়া আপন মনেই গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: সে রকম ত কিছুই দেখছি না!

সবিস্ময়ে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল: কি রকম, সেটা বলই না

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিতে লাগিলেন: দেখছিলুম তোমার অদৃষ্টে সত্যই দাসীত্ব আছে কি না!

নারায়ণীর মুখের উপর বুঝি শরীরের সমস্ত রক্ত উঠিয়া আসিল, মুখ হইতে কথা বাহির হইল না, স্বামীর মুখখানির উপর চাহিয়া রহিল। গাঙ্গুলী মহাশয় স্ত্রীর সেই ভাব দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন: ও কথা বলবার একটু মানে আছে। মজুমদারের গৃহিণী দিন গুণছেন, কবে তুমি পেটের দায়ে তাঁর কাছে গিয়ে হাত পাত—রাঁধুনীর বৃত্তি নিয়ে তাঁকে তৃপ্তি দাও।

কথাটি শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনায় কাণ দুটি লাল হইয়া উঠিলেও মুখে তাহার কোন লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া নারায়ণী বলিল: মজুমদার

গিন্নী বুঝি এই কামনাই করছে এখন ? আর অত ঠোকাঠুকিতেও আমাকে না বুঝে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা মনে এঁটে রেখেছে এখনও, যে আমি—

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন : আমাদের অবস্থার গতি যেভাবে নেমে চলেছে, তাতে এ ধারণা মনে আনা তার পক্ষে ত আশ্চর্য কিছু নয়—কে জানে, আমাদের পরিণাম কি !

দৃপ্তস্বরে নারায়ণী এবার বলিয়া উঠিল : পরিণাম আমাদের আর যাই হোক, তবে এটা ঠিক যে, মা অন্নপূর্ণা আমাকে কাশীতে এনেছেন অন্ন বিলুতে, অন্ন ভিক্ষে করতে নয়। যদি মা এ গরব না রাখেন, তাঁর মন্দিরে গিয়ে মাথা খুঁড়ে মরব তবু মাথা হেঁট করবো না, এ কথা আমি জোর করে ব'লে রাখছি !

স্ত্রীর দৃপ্ত মুখখানির দিকে মুগ্ধভাবে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন : মজুমদার তা জানে, সেইজন্য সে এখন আমাদের আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধিবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে। আমার কিছু নেই জেনে যে-কজন মহাজন নালিশ করেনি, মজুমদার তাদের কাছ থেকে আমার দেওয়া হাত চিঠিগুলো কিনে নিয়েছে—

নারায়ণী বলিল : সেই হাতচিঠিগুলো নিয়ে নালিশ করবার মতলব বোধ হয় এঁটেছে ?

হাঁ শীঘ্রই নালিশ দায়ের করবে। এই সূত্রে আমাকে নাস্তানাবুদ ক'রে বা জেলে পাঠিয়ে সে তখন তোমাদের নিয়েই পড়বে।

নারায়ণী স্বামীর ম্লান মুখের দিকে নিজের অম্লান মুখখানি তুলিয়া সহানুভূতির সুরে বলিল : তাই বুঝি তোমাকে ক'দিন থেকে কেমন অন্যমনস্ক দেখছি ? ছিঃ ! কখন কি হবে, কে কি করবে, এই ভাবনা তুমি মনে টেনে এনে নিজের মাথাটিকে দুর্বল করতে বসেছো ? তুমি না জ্যোতিষী হয়েছ ? তোমার জ্যোতিষ কি বলে ?

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: ডাক্তারের বাড়ীতে রোগ হলে ডাক্তার নিজে তার চিকিৎসা করতে সাহস পায় না। তেমনই নিজের ভাগ্যও নিজে গণনা করতে ভয় হয়।

নারায়ণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল: তুমি কি মনে কর ঐ সুদখোর মজুমদারই আমাদের ভাগ্য-বিধাতা? বিশ্বনাথ কি নিদ্রিত? আমাদের নিয়তি যদি শুদ্ধ থাকে, শত মজুমদার হাজার কারসাজি ক'রেও কিছুই করতে পারবে না, নিজের জালে শেষে নিজেই জড়িয়ে মরবে—এ জ্যোতিষের পুঁথিতে লিখে রেখো।

প্রশংসমান নয়নে পত্নীর সেই উৎসাহ-প্রদীপ্ত মুখখানির দিকে গাঙ্গুলী মহাশয় চাহিয়া রহিলেন।

তিনমাসের স্থলে নয়মাস কাটিয়া গেলো, তবুও গাঙ্গুলী পরিবারের চরম দুরবস্থার কথা নিরুপমার কাণে আসিল না বা নারায়ণী ছেলেপুলে-দের হাত ধরিয়া তাহার দ্বারে ভিক্ষা করিতে আসা দূরের কথা, দায় জানাইয়া সাহায্য চাহিতেও কোনদিন দেখা দিল না। তখন সে মনে মনে স্থির করিল, একদিন নারায়ণীকে বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া দেখিবে, তাহার সে তেজ এখন কতটা শুকাইয়াছে এবং তার হালচালই বা এখন কোন্ ভাবে চলিয়াছে।

উত্তেজনার বশে নিরুপমা স্বামীর প্ররোচনায় এক একখানি করিয়া অনেকগুলি কাগজ বাহির করিয়া দিয়াছিল। মজুমদার তাহার কতক ভাঙ্গাইয়া গাঙ্গুলী মহাশয়ের মহাজনদের নিকট হইতে হাতচিঠিগুলি আধাদামে খরিদ করিয়াছিলেন এবং বাকি টাকাগুলি হাতে লইয়া বড় রকম লাভের প্রত্যাশায় প্রচুর পরিমাণ ঘৃত আড়তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন। ঘৃতের কারবারের সঙ্গে কাপড়ের এক কারবার খুলিবার সঙ্কল্প হঠাৎ মজুমদারের মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। নিরুপমা এবার আর কাগজ

বাহির করিয়া দিল না, স্বামীকে যুক্তি দিল, কাগজ ভাঙ্গাইয়া লোকসান খাওয়া অপেক্ষা বাড়ী বাঁধা দিয়া অল্প সুদে টাকা কর্জ্জ করা বরং ভাল। পরে কাগজের দর কিছু যদি উঠে, তখন তাহা বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা যাইবে। নিরুপমার যুক্তি লঙ্ঘন করিবার সাধ্য মজুমদারের ছিল না, কাজেই বসতবাটী বন্ধক দিয়া ১০ হাজার টাকা লইয়া এক কাপড়ের দোকান খোলা হইল। বাজারে সম্ভ্রম থাকায় দুই কারবারেই ধারে বহু সহস্র টাকার মালপত্র সংগ্রহ করা মজুমদারের পক্ষে কঠিন হয় নাই। বাঙ্গালীটোলায় বাঙ্গালী-সমাজের সহানুভূতির অভাবে, বুদ্ধিমান মজুমদার চক-মহল্লায় বড়গঞ্জের সান্নিধ্যে হনুমানফটকায় তাঁহার ব্যবসায় খুব বড় করিয়া ফাঁদিয়াছিলেন। কাশীর ষ্টেশন ও গঙ্গা নিকটে পড়ায়, মালপত্রের আমদানী রপ্তানীর পক্ষে বেশ সুবিধাই হইতেছিল। নূতন স্থানে আসিয়া অল্পদিনের মধ্যেই কারবার বেশ জাঁকিয়া উঠিতেছিল। সুসময় দেখিয়া মজুমদার এইবার গাঙ্গুলীর সর্বনাশের জন্য অস্ত্র শানাইতে আরম্ভ করিলেন।

গাঙ্গুলী মহাশয় সেদিন বাহিরের ঘরখানিতে বসিয়া একখানি কোষ্ঠী দেখিতেছিলেন, এমন সময় ভগুল গোয়ালা আসিয়া বলিল :—"গাঙ্গুলীবাবু, শুনেছেন ত, মজুমদার আপনার সাবেক দোকান থেকে টাট তুলে নিয়ে হনুমানফটকায় কারবার চালিয়েছে। সে ঘর খালি আছে,—আপনি আবার কারবার লাগিয়ে দিন। আপনার জন্তে বহুৎ মদৎ দেব আমরা জানবেন"।

ঠিক এই সময় আবদুল আসিয়াও ভগুলের কথার পোষকতা করিল। অধিকন্তু সে বলিল :—"হামি লোকে ত আপনার কারবারের খাতে টিন বানাতে সুরু করিয়েছি—আমাদের সবাইকার দিল্ মাঙ্গ্তেছে—গাঙ্গুলী-বাবুর কারবার ফিন্ কায়েম্ হোক্—আপনি ইমানদার, হামি লোক আপনার খাতিরে জান কবুল করব।"

গাঙ্গুলীকে নিরুত্তর দেখিয়া, শেষে এই দুই মুরুব্বী জোর করিয়া ইহাও জানাইল যে,—গাঙ্গুলী বাবুর হাতে টাকা যদি না থাকে, তাহারা তাহারও যোগাড় করিয়া দিবে, মহাজনদের হাতে পায়ে ধরিয়া মাফ দেওয়াইবে,—সাবেক ঘর দখল করা চাই-ই।

গাঙ্গুলী মহাশয় তাঁহার এই ভক্ত দুইটিকে চিনিতেন, সুতরাং তাহাদের কথায় বিস্মিত না হইয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন :—"আচ্ছা, দেখা যাবে ; তাঁর ইচ্ছা যদি হয়ে থাকে, তাই হবে। আমি ভেবে চিন্তে তোমাদের জানাব !"

তাহারা চলিয়া গেলে নারায়ণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁগা, কি বলতে এসেছিল ওরা ?"

গাঙ্গুলী মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"মজুমদার সাবেক ঘর থেকে কারবার তুলে নিয়ে আলাইপুরার দিকে খুব বড় করে আড়ৎ করেছে কি না, তাই এরা বলতে এসেছিল—সাবেক ঘর ভাড়া নিয়ে আমি আবার কারবার সুরু করি।"

কথাটা শুনিয়াই যেন এক অপ্রত্যাশিত আনন্দে নারায়ণীর মুখখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে সহসা বলিয়া ফেলিল :—"আমারও অনেক সময় এই কথা মনে হয়। এই কারবারে আমরা পড়েছি, আবার এর উপরেই ভর দিয়া আমরা উঠ্‌বো।"

স্ত্রীর মুখের দিকে সকৌতুকে চাহিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন :— "তুমি যে দেখছি আজকাল জ্যোতিষীর উপরেও টেক্কা দিয়ে চলেছ ! 'না বিইয়েই কানায়ের মা' হওয়ার মত, একবারে যে হঠাৎ গণৎকার হয়ে উঠলে দেখছি !"

নারায়ণী কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়াই উত্তর দিল :—"গণৎকার বলে—গ'ণে,—সে ত সব সময় খাটে না, ভুলচুক হয়ে যায়। আর আমি যে

কথা বলি হঠাৎ,— সেটা আমার মনের, মায়ের ইচ্ছায় আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে; এ মিথ্যা হবার নয়। দেখে নিও তুমি,—কারবার আমাদের হ'ল ব'লে!"

হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন:—"তা হ'লে মজুমদারের অস্ত্রগুলো অন্ততঃ শানানো সার্থক হয় বটে,—শাঁকের করাতের মত দুদিক দিয়েই কাটবার সুবিধেটি তার হয়ে যায়!"

ছোট মেয়ে আসিয়া বলিল:—"খাবার জায়গা করেছি, মা!"

নারায়ণী প্রসঙ্গটি পরিত্যাগ করিয়া বলিল:—"বেলা অনেক হয়েছে, আমি ভাত বাড়তে চললুম, তুমিও হাত পা ধুয়ে খেতে বসবে এস—"

নারায়ণী পাথরের থালায় ভাত বাড়িতেছে,—গাঙ্গুলী মহাশয় হাত মুখ ধুইতেছেন, এমন সময়ে নিরুপমার দাসী আসিয়া হাসিমুখে বলিল:— "চিনতে পার দিদিমণি?"

নারায়ণী তার মুখের দিকে চাহিয়া সহজ ভাবেই জিজ্ঞাসা করিল:— "মজুমদার বাড়ীতে তুমি ছিলে না?"

হাসিয়া দাসী বলিল:—"হ্যাঁগো দিদিমণি, এখনও সেইখানেই আছি। আহা, তখন কি ইন্দিরের ঐশ্বর্য্যিই না ছ্যাল তোমাদের—কি দেখেছি"—

গম্ভীর হইয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল:—"কি মনে ক'রে হঠাৎ এই উৎকণ্ঠার সময় আসা হয়েছে শুনি?"

দাসী বলিল:—"দিদিমণি পাঠালেন কিনা; আসবার ত সময় পাই না—এই সময় একটু ফুরসুৎ পাই, তাই এসেছি। হাঁ—যা বলতেছিলুম,— আপনাদের অনেকদিন না দেখে দিদিমণির ভারি মন-কেমন করছে কিনা —তাই তিনি বলে পাঠিয়েছেন—কাল দুপুর বেলায় ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করে তোমার ওখানে গিয়ে দুটি শাক ভাত খাবে। আমি এসেই নিয়ে যাবো তোমাদের।"

ক্ষমতার অহঙ্কারে মানুষ যে নির্লজ্জের মত এতটা অগ্রসর হইতে পারে, তাহা ভাবিতেও নারায়ণীর দেহ-মন তপ্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু দাসী-পরিচারিকার কাছে উদ্বেল হৃদয়-দ্বার উদ্‌ঘাটিত না করিয়া সে তাহার স্বভাবসিদ্ধ সতেজ স্বরেই বলিল:—"তোমার দিদিমণিকে ব'ল—যা মনে করে তিনি আমাদের তলব করেছেন, এখন ছেলেমেয়েদের হাত ধরে তাঁর সামনে গিয়ে আমি যদি দাঁড়াই তাঁর মন-কেমন করাটি কমবে না—আরও বাড়বে তাতে। কাষেই সময় হ'লে, আমি নিজেই তাঁর কাছে যাব।—বুঝলে?"

ঠিক এই সময় বড় ছেলে ছুটিয়া আসিয়া বলিল:—"মা বাহিরে একজন অতিথি এসেছে। সে কেবল মুখ আর পেট দেখিয়া ইসারা করে বলছে—ভুখ লেগেছে, খাবো।"

গাঙ্গুলী মহাশয় তখন সবেমাত্র বসিবার জন্য আসনখানির উপর গিয়া দাঁড়াইয়াছেন,—তৎক্ষণাৎ তিনি তাড়াতাড়ি বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দাসী ঝেজার হইয়া বলিল:—"আ-মরণ, ঠিক-দুপুর বেলায় এসে বলেন—খাবো, পিণ্ডি যেন তাঁর এখানে—"

নারায়ণী দুই চক্ষুতে অগ্নির ঝলক তুলিয়া তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, : "তুমি চুপ করত বাছা, এসেছ, ব'সে থাক চুপ ক'রে, তোমার মুখে এসব কথা কেন বলত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় আসিয়া ব্যস্তভাবে বলিলেন, : "কথা কিছু বললেন না, আমাদের ভাত তরকারি সবই খাবেন,—আমি তাঁকে বসিয়ে এ, শীগগীর একখানা পাথরে সব সাজিয়ে নিয়ে যাও, তিনি ভারি ব্যস্ত—"

বাহিরের ঘরখানির পাশে, অন্দরের পথটির ধারে, অলিন্দের মত একটু স্থান ছিল। সেইখানেই অতিথি বসিয়াছিলেন। তাঁহার পরিচ্ছদ দেখিলে সাধু-সন্ন্যাসী বলিয়া মনে হয় না,—পরণে ছিল

একখানি আধময়লা লালপেড়ে ধুতি, গলায় যজ্ঞোপবীত, মাথায় একখানা গামছা পাগড়ীর মত বাঁধা, বাহুমূলে একছড়া রুদ্রাক্ষের তাগা, ললাটে রক্তচন্দনের একটি ফোঁটা, শ্মশ্রুগুম্ফে মুখখানি আচ্ছন্ন হইলেও, মুখে একটি উদাসভাব প্রকাশ পাইতেছিল, সর্বাপেক্ষা চিত্তাকর্ষক তাঁহার দুইটি চক্ষুর উজ্জ্বল দৃষ্টি।

নারায়ণী একখানি শ্বেত পাথরে অন্নব্যঞ্জনাদি সাজাইয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া দিয়া গলবস্ত্রে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, : "অতিথি-বিশ্বনাথের সেবা ইচ্ছামত করবার শক্তিই আজ আমাদের নেই, বাবা! অভাবগ্রস্তের শাক-অন্ন দয়া করে গ্রহণ ক'রতে হবে!"

অতিথির তীব্রদৃষ্টিপূর্ণ নয়ন দুইটি যেন অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্তস্বরে হাউ হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন! সে কি করুণ রোদন! সকলেই স্তব্ধ, সন্ত্রস্ত;—গাঙ্গুলী মহাশয় ও নারায়ণী যতই জিজ্ঞাসা করেন, : "কি অপরাধ আমাদের হ'ল বাবা!—কেন কাঁদছ?, বল বল?" কিন্তু বলিবেন কি? ক্রন্দন আর থামে না!—নারায়ণীর অন্তর পর্যন্ত হাহাকার করিয়া উঠিল, দিবাদ্বিপ্রহরে অন্ন-ভোজ্য ক্রোড়ে লইয়া অতিথির এ রোদন কেন? হে বিশ্বনাথ—একি লীলা! হঠাৎ সেই উচ্ছ্বসিত রোদনের ভিতর হইতে হো হো শব্দে বিকট হাসির ধ্বনি উঠিল। তাহার পরেই ভোজনের পালা হইল আরম্ভ। সমস্ত অন্ন ব্যঞ্জন নিঃশেষ করিয়া, ইঙ্গিতে পরম পরিতৃপ্তি জানাইয়া এই অদ্ভুত অতিথি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আচমনান্তে যাইবার সময় সহসা ফিরিয়া নারায়ণীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিলেন; পরক্ষণে হাতখানি ঊর্ধ্বে তুলিয়া বার দুই ঘুরাইয়া টলিতে টলিতে চলিয়া গেলেন, ফিরিয়াও তাকাইলেন না আর।

বাড়ীশুদ্ধ সকলেই স্তব্ধ, আনন্দও যে হয় নাই, তাহাও নহে। তবে

বেশী আনন্দ হইয়াছিল সেই দাসীটির, দিদিমণির কাছে গিয়া নূতন সমাচার দিবার মত অনেক কিছুই সে সংগ্রহ করিয়াছিল।

আহারান্তে বাহিরের ঘরে বসিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে গাঙ্গুলী মহাশয় ধূমপান করিতেছিলেন, এমন সময় ডাক-পিয়ন আসিয়া সহাস্যে বলিল: "একটি ইনসিওর আছে, গাঙ্গুলীবাবু—"

সবিস্ময়ে গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: "ইনসিওর? আমার নামে?"

পিয়ন বলিল,: "হ্যাঁ, বাবুজি, এই তার ইনটিমেশন—বড় ডাকখানা থেকে ছাড়িয়ে আনবেন। বেশী টাকার ইনসিওর ত আমাদের বিলি করতে দেয় না।"

রসিদ সহি করিয়া, পিয়নকে বিদায় দিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় ইন্‌টিমেশন-খানির টাকার অংশ পড়িয়া ভাবিলেন, হয়ত নাম ভুল হইয়াছে; বর্তমান অবস্থায় তাঁহার নামে পাঁচশত টাকা পাঠাইবার ত কেহ নাই! কিন্তু বার বার তিনবার পড়িয়া দেখিলেন, নাম ও ঠিকানার কিছুমাত্র ভুল চুক হয় নাই। [illegible] কে এই টাকার প্রেরক? কৌতূহলের সঙ্গে পড়িলেন:

"এস্‌ কে রায়, এটোয়া।" কিন্তু এটোয়ার এমন কোন লোককেই তাঁহার মনে পড়িল না, যাহার সঙ্গে তাঁহার বিন্দুমাত্র পরিচয় আছে। তখন সহসা তাঁহার মনে হইল, এই ভাবে মিথ্যা ইন্‌সিওর পাঠাইবার একটি জুয়াচুরি ব্যাপার তিনি কাগজে পড়িয়াছিলেন বটে! ইহাও হয়ত সেই ভাবের কিছু হইবে। যাহা হউক, তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া বড় ডাকঘরের উদ্দেশে তখনই বাহির হইয়া পড়িলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে গাঙ্গুলী মহাশয়কে কিছু উৎকণ্ঠিত ভাবেই ফিরিতে দেখিয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল: "খেয়ে দেয়ে একটু না জিরিয়েই এই রদ্দুরে বেরিয়েছিলে কোথায়?"

গাঙ্গুলী মহাশয় নিজের স্থানটিতে বসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন: "ব'স কথা আছে।"

স্বামীর মুখের প্রতি রেখাটি নারায়ণীর পরিচিত ও অর্থ সুস্পষ্ট। কিন্তু এদিন এমন কিছু নূতন রেখার আভাস পাইল যাহা সত্যই অপ্রত্যাশিত। সুতরাং কথাটা শুনিবার জন্য ব্যগ্র ভাবেই তক্তপোষখানির একধারে বসিয়া পড়িল।

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: "বছর বারো আগে সত্যকুমার বলে একটি ছেলে ঘিয়ের কাজ শেখবার জন্য আমাদের কারবারে এসেছিল, মনে পড়ে?"

নারায়ণী বলিল: "পড়ে বৈকি। তুমি তাকে ছেলের মত যত্ন করে কারবারে নিয়েছিলে ব'লে মজুমদার মশায়ের কি লাগানি-ভাঙ্গানী!"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন: "শেষে আমি ত্যক্ত হয়ে ছেলেটিকে আলাদা দোকান খুলতে পরামর্শ দিয়েছিলুম, আর দোকান চালাবার মত মালও তখন তাকে ধারে দিই। ছেলেটি বছর তিন বেশ ভাল রকমই কাজ চালিয়েছিল, তারপর কি ভেবে, দোকান-পাট তুলে দিয়ে আমার হিসেব-পত্র মিটিয়ে দিয়ে চ'লে যায়। তখন শুনেছিলুম কাণপুরে গিয়ে কাজকর্ম্ম করবে। তারপর আর কোন পাত্তাই তার পাওয়া যায় নি।"

নারায়ণী বলিল: "আজ যে হঠাৎ তার কথা নিয়ে এত চর্চা? ব্যাপারখানা কি?"

গাঙ্গুলী মহাশয় গম্ভীরভাবে বলিলেন: "ব্যাপার একটু আছে বৈকি। এটোয়া থেকে সে হঠাৎ আমার নামে পাঁচশো টাকার এক ইন্সিওর পাঠিয়েছে।"

সবিস্ময়ে নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল: "কেন বলত?"

গাঙ্গুলী মহাশয় ইন্সিওর করা লম্বা লেফাফাখানি বাহির করিয়া

তাহার ভিতর হইতে একশো টাকার পাঁচ কেতা নোট ও সেই সঙ্গে একখানি কয়েক পৃষ্ঠাব্যাপী দীর্ঘ পত্র বাহির করিলেন। তারপর বলিলেন, : "পত্রখানি পড়ি—শোন, ব্যাপার সব বুঝতে পারবে। পত্রের সবটি তুমি সময় মত প'ড়—আমি শুধু শেষটুকুই পড়ছি।"—

গাঙ্গুলী মহাশয় পত্রখানির শেষাংশ পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে লেখা ছিল : কানপুরে তিনটি বৎসর কাটাইয়া ঘিয়ের এনালাইজ করা কাজটি শিক্ষা করিয়া এটোয়ায় আসিয়া উপস্থিত হই। আপনার আশীর্বাদে আপনারই শিক্ষায় শিক্ষিত ও আপনার নিকট অপরিশোধ্য ঋণপাসে আবদ্ধ, আপনারই শিষ্যস্থানীয় সত্যকুমার রায় এটোয়ায় ঘিয়ের ব্যাপারে আজ সর্বেসর্বা। অসংখ্য অ-বাঙ্গালীর মধ্যে বাঙ্গালীর এই প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া আপনার ন্যায় মহানুভব নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন সন্দেহ নাই। আপনার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের কথা কাশীর 'প্রবাস-জ্যোতি' পত্রে অবগত হই। আপনার উদ্দেশে কয়েকখানি পত্রও লিখিয়াছিলাম ; কিন্তু কোনও উত্তর পাই নাই। শেষে সম্প্রতি আপনার সেই বিখ্যাত ডাক্তার-বন্ধু অমিতাভ বাবু এখানে চেঞ্জে আসেন। তিনি এখনও সপরিবারে এখানেই রহিয়াছেন। তাঁহার নিকট সমুদয় শুনিয়া, আপনার অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমি এক ওয়াগান ঘি আপনার বরাবর ডেসপ্যাচ করিতেছি। ইহাতে আপনার লোকসানের কোনও দায়িত্ব নাই,—আড়তদার হিসাবে আপনি ইহা কাটাইবার ব্যবস্থা করুন। আমি নিজ হইতে মাশুল দিয়াই মাল পাঠালাম। চুঙ্গী করা, ওয়াগণ হইতে ঘিয়ের টিনগুলি খালাস করিয়া গুদামে লইয়া যাওয়া, গুদাম ভাড়া, আফিস প্রভৃতির জন্ত আমি পাঁচশত টাকা অগ্রিম পাঠাইতেছি। আমার এই কার্য্যে বিস্মিত হইবার বা আমাকে ধন্তবাদ দিবার কিছুই নাই। পাশ্চাত্যদেশে শুনা যায়, কেহ কোন কারবার করিয়া

প্রতিষ্ঠালাভ করিলে, সেই কারবারটি সূচনা করিবার সময় যাহাদের নিকট সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহাদের সম্মান রক্ষা করিতে বিস্মৃত হন না। আমি যদি কাশীতে আপনার সংস্পর্শে না আসিতাম, আজ তাহা হইলে এত বড় প্রতিষ্ঠালাভের অবকাশ পাইতাম কি না, কে জানে! আমার এই প্রতিষ্ঠার মূলই যে আপনি গাঙ্গুলী মহাশয়! রেলের রসিদ ও চালান রেজেষ্টারী করিয়া সত্বর পাঠাইতেছি।

পড়িতে পড়িতে গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুই চক্ষু অশ্রুময় হইয়া উঠিল—আর নারায়ণীর দুইটি আর্দ্রনেত্রের উপর তখন শুধু প্রতিফলিত হইতেছিল,—করুণাময়ী জগজ্জননীর সেই রক্তিমাময় অভয় হাতখানি।

মজুমদারের 'উদ্ধত ব্যবহার তরুণ সঙ্ঘকে সহসা ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। নানাদিকে তাঁর শত্রু বৃদ্ধি হইতেছিল। হঠাৎ একদিন সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল, সহসা ঘিয়ের বাজার নামিয়া যাওয়ায়, মজুমদার ভয়ানক লোকসান খাইয়াছেন, এবং তজ্জন্য তিনি দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতেছেন। ফলতঃ লোকসান খাইবার কথাটি সত্য হইলেও দেউলিয়া হইবার প্রসঙ্গটি সম্পূর্ণ অলীক। কিন্তু এই মিথ্যা অপবাদ যাহারা প্রচার করিয়াছিল, তাহাদের অপূর্ব তৎপরতায় কথাটি ব্যাপক ভাবে সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ায় অত বড় বুদ্ধির জাহাজ মজুমদার মহাশয়কে একদিনেই মাৎ হইতে হইল। সকালে দোকান খুলিতেই সমস্ত পাওনাদার একসঙ্গে আসিয়া টাকার তাগাদা আরম্ভ করিল। বাড়ীতে বসিয়া সমস্ত শুনিয়া মজুমদার প্রমাদ গণিলেন। তাঁহার পরামর্শদাতা উকিলের শরণাপন্ন হইলে তিনি অবস্থার কথা শুনিয়া, কলিকাতার এক নজির টানিয়া বলিলেন যে, সেখানে এক নামী ব্যবসায়ীরও নাকি এইরূপ বিপদ আসিয়াছিল। তাঁহার দেনার পরিমাণ ছিল কয়েক লক্ষ টাকা, কিন্তু তিনি সমস্ত সম্পত্তি ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে

সিকিউরিটি রাখিয়া সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিলেন! তাহার পর পুলিস পাহারায় থলিবন্দী কাঁচা টাকাগুলি তাঁহার দোকানে আনিয়া ঝম্‌ঝম্ শব্দে ঢালিবার হুকুম দিলেন। আর মালিকের দারোয়ানরা দেউড়ী হইতে তর্জন করিয়া এক এক পাওনাদারের নাম ধরিয়া হাঁকিতে লাগিল এবং মালিক তাহার হিসাব কড়ায় গণ্ডায় চুকাইয়া দিয়া ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—'রাম-রাম! আর আমার দোকানে তুমি মাথা গলিও না!'—পাঁচ সাতজন পাওনাদারের হিসাব এইভাবে চুক্তি হইলে, অন্যান্য পাওনাদাররা বুঝিলেন, মালিকের দেউলিয়া হইবার সংবাদ মিথ্যা; তখনই তাহারা সেলাম বাজাইয়া হিসাব না লইয়া চলিয়া গেল এবং যাহারা হিসাব চুকাইয়া লইয়াছিল ভবিষ্যতে ঘর মারা যাইবার ভয়ে, তাহারাও ত্রুটি স্বীকার করিয়া—টাকা ফেরত দিয়া মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিল।

এই নজীরসূত্রে সেই বিখ্যাত ব্যবসায়ীর নামটি শুনিয়া, বুদ্ধিমান মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার পন্থা অবলম্বন করিতে প্রস্তুত হইলেন। নিরুপমাকে রাজি করাইয়া, সমস্ত সম্পত্তি কোম্পানীর কাগজ, এমন কি নিরুপমার মূল্যবান্ অলঙ্কারগুলি পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কে সিকিউরিটি রাখিয়া সোত্তর হাজার টাকা সংগ্রহের ব্যবস্থা হইল। কাঁচা টাকা সেদিন পাওয়া না যাওয়ায়, স্থির হইল, পরদিন বেলা তিনটার মধ্যে এই টাকা মজুমদার মহাশয় বুঝিয়া লইবেন ও দুইজন কনেষ্টবলের পাহারায় তাঁহার আড়তে লইয়া যাইবেন। এই যুক্তি অনুসারে পাওনাদারদের বলিয়া দেওয়া হইল যে, তাহারা যেন পরদিন অপরাহ্ণে কাঁটায় কাঁটায় ঠিক পাঁচটার সময় আড়তে আসিয়া তাহাদের হিসাব চুকাইয়া লইয়া যায়।

এইদিন সন্ধ্যার পর এই অঞ্চলে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইল। পাঁচ সাতখানি বিলাতি কাপড়ের দোকানের মালিক আগা খাঁ

নামে এক পাঞ্জাবী ধনী মুসলমান দোকান বন্ধ করিয়া যখন বাসায় ফিরিতেছিলেন, হঠাৎ কে তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলী করে। তাহার ফলেই হতভাগ্যের ইহলীলার অবসান হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ডের কথা সন্নিহিত মুসলমান-প্রধান বস্তিগুলিতে প্রচারিত হইয়া পড়িল। লুণ্ঠন-প্রিয় নিষ্কর্মা বদমাইস্ গুণ্ডার দল এই ব্যাপারটিকে তাহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির একটি চমৎকার উপায়রূপেই বরণ করিয়া লইল। রাতারাতিই নানাস্থানে গুণ্ডাদল সমবেত হইয়া এই হত্যাসূত্রে লুণ্ঠনরাজের পরামর্শ আঁটিতে লাগিল। অথচ, এই সলা-পরামর্শ এমনই গোপনে সম্পন্ন হইল যে, বাহিরের কেহই এ সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারে নাই।

পরদিন অপরাহ্ণে এক বিরাট মিছিল করিয়া নিহত আগা খাঁর মৃতদেহ ষ্টেশনে নীত হয় এবং স্পেশাল ট্রেণে তাহা সরাসরি লাহোরে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা থাকে। শবযাত্রা সমাধা করিয়া এই মিছিল সহসা উত্তেজিত হইয়া সমগ্র আলাইপুরা মহল্লায় ছড়াইয়া পড়ে। আগাখাঁর শবযাত্রা উপলক্ষে এই অঞ্চলের মুসলমান দোকানগুলি এদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু হিন্দু দোকানদাররা দোকান বন্ধ করিবার কোনও যুক্তিযুক্ত হেতু না দেখিয়া দোকান খুলিয়া রাখিয়াছিল। মিছিলের সেই উত্তেজিত জনতা সন্নিহিত দোকানগুলির উপর আপতিত হইয়া বলপূর্বক দোকান বন্ধ করিয়া দিবার প্রসঙ্গে গায়ে পড়িয়া বিবাদ বাধাইল। দেখিতে দেখিতে দোকানগুলি লুঠ হইতে লাগিল।

মজুমদার মহাশয় তিনটার পূর্বেই সুশৃঙ্খলে টাকার থলিগুলি পুলিশ পাহারায় আনাইয়া আড়তের গদিঘরে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। আড়তের সকলেই টাকার রক্ষণাবেক্ষণে গদিঘরে আসিয়া সমবেত হইয়াছিল। পাছে পুলিশ অতিরিক্ত পারিশ্রমিক দাবী করে, তজ্জন্য কনেষ্টবল দুইজনকে আর দোকানে আটকাইয়া রাখা হয় নাই।

মজুমদার মহাশয় তাঁহার কর্মচারীদিগকে শিখাইতেছিলেন,—যেমন পাওনাদারের দল আড়তের হাতায় আসিয়া উঠিবে, অমনই তিন চারিটি থলির মুখ খুলিয়া টাকাগুলি এমন কায়দায় মেঝের উপর ঢালিয়া দিবে যে আওয়াজ শুনিয়াই যেন তাহারা ঘাবড়াইয়া যায়।

পাঁচটার কিছু পূর্বেই আড়তের চারিধারে গোলমাল উঠিল এবং কয়েকজন গুণ্ডা আড়তের হাতার মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকেই পাওনাদার মনে করিয়া কর্মচারীরা মজুমদারের শিক্ষামত একসঙ্গে পাঁচটি থলের মুখ খুলিয়া টাকাগুলি ঢালিয়া ফেলিল,—মধুর-গম্ভীর ঝম্‌ঝম্ শব্দে আড়ৎ মুখরিত হইয়া উঠিল। আর যায় কোথায়—দেখিতে দেখিতে লাঠি, শড়কি, শাবল, ভোজালি, তরবারি, টাঙ্গী প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত গুণ্ডার দল আড়তের ভিতরে ঢুকিয়া মজুমদারের সযত্ন সংগৃহীত অর্থ-সম্পদ লুঠ করিতে লাগিল।

আগা খাঁর হত্যাকাণ্ড এই হাঙ্গামার মূলতত্ত্ব হইলেও একদল গুণ্ডাই যে দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়াছিল এবং মুসলমান-প্রধান অঞ্চলে প্রবল হইয়া হিন্দুদের যাবতীয় দোকান, দেবায়তন প্রভৃতি লুণ্ঠন করিয়াছিল, বহু হিন্দুকে লাঞ্ছিত ও হতাহত করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এদিকে বাঙ্গালীটোলা ও অন্যান্য স্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুগণও দলবদ্ধ হইয়া মহল্লার রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া, বিপন্ন হিন্দু-সমাজের সহায়তার জন্য উত্তেজিত হইয়া উঠিল। পক্ষান্তরে, আলাইপুরা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানগণ বাঙ্গালীটোলা অঞ্চলের অবরুদ্ধ মুসলমানদের সাহায্যকল্পে আসিবার জন্য পায়তারা কষিতে লাগিল! ঠিক এই সময় সৈন্যদল ও প্রচুর পুলিশবাহিনী সংযোগ স্থানগুলিতে সমবেত হইয়া উভয় পক্ষকেই নিরস্ত করে। ফলে মুসলমান-প্রধান স্থানসমূহে মুসলমানগণ যেমন অত্যাচার চালাইতেছিল, হিন্দু-প্রধান স্থানসমূহে হিন্দুগণও তেমনই

তাহার পাল্টা জবাব দিতেছিল। পক্ষান্তরে, সহৃদয় ও ন্যায়নিষ্ঠ হিন্দু ও মুসলমান সুধীবৃন্দ উভয় সম্প্রদায়ের বিপন্নগণকে যথাশক্তি সাহায্য ও তাহাদের রক্ষার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন।

বেনিয়া-পার্কের সন্নিহিত পল্লীগুলির অধিকাংশই শ্রমিক-প্রধান এবং একদল সুবিধাবাদী হাঙ্গামার সূচনার সঙ্গে সঙ্গে চেংগঞ্জ হইতে বেনিয়া-পার্ক পর্য্যন্ত স্থানে সমবেত হইয়া ষ্টেশন হইতে শহরাভিমুখে সমাগত যাত্রীদের মালপত্র লুণ্ঠনে ও নিষ্ঠুরভাবে নির্য্যাতনে দলবদ্ধ হইয়াছিল। আবদুল ও ভগুল আসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয়কে জানাইল :—"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন গাঙ্গুলী বাবু, আপনার কোন ভয় নাই।"

গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন :—"যদি আমাকে তোমরা নিশ্চিন্ত করতে চাও তা হলে তোমরা দলবল নিয়ে বাগানের মোড়ে মওড়া নাও,—নিরীহ যাত্রীদের রক্ষা কর।"

গাঙ্গুলী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতে বাগানের মোড়ে রাস্তার উপর গুণ্ডাদের হল্লা শোনা গেল। লাঠির ঠকাঠক শব্দের সহিত খবর আসিল একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীকে ঘিরিয়া একদল গুণ্ডা গাড়ীর উপর লাঠি চালাইতেছে। আবদুল বাহিরে আসিয়া জোরে একটা আওয়াজ দিতে লাঠি হাতে বিশ পঁচিশ জন জোয়ান ছুটিয়া আসিল, তাহাদের মধ্যে ভগুল ও কয়েকজন আহীরও ছিল। আবদুলের সহিত সকলেই অকুস্থলে ছুটিল, গাঙ্গুলী মহাশয়ও তাহাদের অনুসরণ করিল। অকুস্থলে গিয়া দেখা গেল, ঘোড়াটা জখম হইয়াছে, গাড়ীর নানাস্থান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গী সাংঘাতিক ভাবে জখম হইয়াছে। গুণ্ডারদল তখন ঘোড়ার মুখ ধরিয়া গাড়ী ফিরাইয়াছে। গাড়ীর আরোহাদের মধ্যে জনৈক বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর উপর ছোরা চালাইয়া দুইজন গুণ্ডা সালংকারা মাড়োয়ারী মহিলা ও তাহার শিশুপুত্রটিকে টানিয়া

বাহিরে নামাইয়াছে। ঠিক এই সময় আবদুলের দল আসিয়া তাহাদের ঘিরিয়া ফেলিল। আবদুল ও ভণ্ডুলকে দেখিয়াই গুণ্ডারা সেলাম বাজাইল। আবদুল কি একটা ইশারা করিতেই তাহারা সদলবলে ঝড়ের মত চলিয়া গেল। গাঙ্গুলী মহাশয় ভণ্ডুলের সহায়তায় মাড়োয়ারী মহিলা ও তাহার ছেলেটিকে নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। নারায়ণীর হাতে তাহাদের শুশ্রূষার ভার দিয়া পুনরায় যথাস্থানে আসিয়া দেখিলেন বৃদ্ধের অবস্থা সাংঘাতিক, গাড়োয়ান ও তাহার সঙ্গী দুইজনেরই মাথা ফাটিয়াছে, হাত ভাঙ্গিয়াছে, রক্তে গাড়ীর গদীও নীচের রাস্তা ভিজিয়া গিয়াছে। সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখিয়া তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। গাড়ীর ছাদের উপরে যে সব মালপত্র ছিল, সেগুলি তখনও লুণ্ঠিত হয় নাই—ঠিক আছে। ভণ্ডুলের জিম্মায় সেসব দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় আহতদিগকে সেই গাড়ীতেই কবিরচৌড়ার সরকারী হাসপাতালে লইয়া চলিলেন। আবদুল ও কয়েকজন আত্মীয় রক্ষীরূপে তাঁহাদের অনুগমন করিল; আবদুলের এক অনুচর ঘোড়ার মুখ ধরিয়া কোনরূপে গাড়ী খানি টানিয়া লইয়া চলিল। হাসপাতালে গিয়া দেখা গেল, অত বড় বাড়ী এই ব্যাপারে একেবারে পরিপূর্ণ,—যেন যুদ্ধের হাসপাতালে পরিণত হইয়াছে। অতিকষ্টে আহত বৃদ্ধের জন্য যথাসম্ভব সুব্যবস্থা করিয়া দিয়া, গাঙ্গুলী মহাশয় গাড়ী-ঘোড়া হাসপাতালের জিম্মাতেই রাখিয়া দিলেন। ফিরিবার পূর্ব্বে তিনি পুনরায় বৃদ্ধ মাড়োয়ারীর শয্যাপ্রান্তে গিয়া আশ্বাস দিলেন,—"আমি বাঙ্গালী, আপনার সঙ্গে গাড়ীতে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের জন্য আপনি উদ্বিগ্ন হবেন না। তাঁরা আমার বাড়ীতেই আছেন। আমি নিত্য এসে আপনার খবর নেবো।"

সাংঘাতিকভাবে বক্ষে আঘাত পাওয়ায় বৃদ্ধ বাকশক্তি হারাইয়াছিলেন।

তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রশান্ত মুখখানির উপর গম্ভীর মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন মাত্র।

মাড়োয়ারী মেয়েটির দেহে যদিও কোন আঘাত পড়ে নাই, কিন্তু সেই ভয়াবহ ব্যাপারে সে এতদূর ভয়াতুর হইয়া পড়িয়াছিল যে, ঘন ঘন তাহার মূর্চ্ছা হইতেছিল, ছেলেটি যদিও ছেলেদের দলে মিশিয়া গিয়াছিল, কিন্তু মায়ের অবস্থা দেখিয়া সেও মাঝে মাঝে কাঁদিতেছিল। নারায়ণী একখানি স্বতন্ত্র ঘরে তাহাদের শয্যা পাতিয়া দিয়া স্বহস্তে সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল।

পাঁচদিনব্যাপী ভয়াবহ দুর্য্যোগের পর শান্তির হাওয়া বহিল। নেতৃবর্গের উপস্থিতি, স্থানীয় সম্ভ্রান্ত হিন্দু মুসলমানের চেষ্টা এবং খোদাই চৌকির সুযোগ্য কোতোল সাহেবের অক্লান্ত পরিশ্রমে উভয় পক্ষই শান্ত সংযত হইল।

হনুমান কটকায় হিন্দুদের যে সব দোকান ও আড়ৎ ছিল, তন্মধ্যে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল মজুমদার মহাশয়ের সুবৃহৎ ব্যবসায়। নগদ ৭০ হাজার টাকাতো প্রথম দিনই লুণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার পর দোকানের সমস্ত মালপত্র শত শত ঘৃতপূর্ণ টিন, কাপড়ের বড় বড় গাঁট সমস্তই প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠ হইয়া যায়। তৃতীয়দিনে দোকানের অফিসঘর ও গুদামে গুণ্ডারা অগ্নিসংযোগ করিয়া দেয়, ফলে অফিসের কাগজ পত্র, হাতচিঠি, খাতা, খতিয়ান, চেয়ার, টেবিল, আলমারি প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়। নগদ টাকাগুলি লুণ্ঠনকারীদের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য মজুমদার মহাশয় ও তাঁহার লোকজন মরিয়া হইয়া উঠিলেও, গুণ্ডাদের সংখ্যাধিক্যে লাঞ্ছনা ও প্রহার সহ্য হইয়াছিল। মজুমদার মহাশয় মাথায় একটি বড় রকমের আঘাত পান। আহত অবস্থায় যখন তিনি বাড়ীতে নীত হন, তখন তাঁহার

সংজ্ঞা ছিল না; লোকজনের মুখে সবিশেষ শুনিয়া, নিরুপমা কপালে করাঘাত করিয়া আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল—স্বামীর সাংঘাতিক অবস্থা অপেক্ষা সর্বস্বনাশের দুশ্চিন্তা তাহাকে অধিকতর মুহ্যমান করিয়া ফেলিয়াছিল।

মাড়োয়ারী মহিলাটি ক্রমে সুস্থ হইয়া প্রকাশ করিলেন যে গাড়ীর ভিতরে যে বৃদ্ধটির উপর গুণ্ডারা ছোরা চালাইয়াছিল, তিনি তাঁহার পিতা। বিকানির হইতে পিতার সহিত একমাত্র পুত্রকে লইয়া কাশীতে তিনি সেই দিনই আসিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কখনও কাশীতে আসেন নাই—তাঁহার স্বামী কাশীতেই কারবার করেন। তাঁহার ঠিকানা পিতার জানা আছে, মহিলাটি সে সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

সমগ্র সহরেও সেদিন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে, অশান্তির কোন চিহ্নই আর নাই। পাঁচটি দিন পরে কাশী অধিবাসীরা মুক্ত বাতাসে বাহির হইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিয়াছে। সেদিন আবার শিবরাত্রির পর্ব। অন্যান্য বর্ষের এই দিন বারাণসী আনন্দোৎসবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত, অসংখ্য ভক্তসমাগমে শিবপুরী যেন টলমল করিত। এবার সে উল্লাস নাই, পরিত্যক্ত নগরীর মতই যেন নিঝুম, নিস্তব্ধ।

গাঙ্গুলী মহাশয় আবদুলকে লইয়া হাসপাতালে আহত মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির সংবাদ লইতে চলিলেন। হাসপাতালের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণটি আজ আহতদের পরিজনে পরিপূর্ণ। বহু চেষ্টার পর সেই ভদ্রলোকটির শয্যার নিকট গিয়া, তাঁহার অতি পরিচিত এবং কাশীর শ্রেষ্ঠ ধনাঢ্য মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী বদরীনারায়ণজীকে সেই স্থানে উপস্থিত দেখিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় চমকিয়া উঠিলেন। এই বিখ্যাত ব্যবসায়ীর সহিত তাঁহার কয়েক লক্ষ টাকার কারবার হইয়া গিয়াছে, শেষে তাঁহার দুর্দ্দিন যখন

ঘনাইয়া আসে, হাজার পনের টাকার জন্য এই বদরীনারায়ণ মাড়োয়ারীই প্রথম নালিশ করিয়া তাঁহার বসতবাটিখানি নীলামে তুলে এবং শেষে কৌশলপূর্ব্বক নিজেই অপর নামে দেনার পরিমিত টাকাতেই ডাকিয়া লইয়াছিল। গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখিয়াই বদরীনারায়ণ বলিয়া উঠিল: "রাম, রাম, বাবু সাহেব, কি হালচাল আছে?"

গাঙ্গুলী মহাশয় উত্তর দিলেন: "দেখতেই পাচ্ছেন, হালচালের ঘটা!" ইদানীং প্রতিপক্ষস্থানীয় ভদ্র ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগকে গাঙ্গুলী মহাশয় অতি সন্তর্পণেই এড়াইয়া চলিতেন। পক্ষান্তরে অশিষ্ট, অভদ্র, অশিক্ষিত, ভদ্রসমাজে অচল ও অপাংক্তেয় চাষী, মুনিষ, শ্রমিক, শিল্পীদের সঙ্গ তেমনি তাঁহাকে প্রচুর আনন্দ দিয়া থাকে। সমাজে গণ্যমান্য বরেণ্য বা ধনাঢ্য কোন ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে তিনি নিজেকে যেন বিপন্ন মনে করিতেন। সুতরাং শহরের এই শ্রেষ্ঠ ধনী লোকটির কাছে দাঁড়াইতেও তাঁহার অমন প্রশান্ত মনটি যেন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল; শয্যাশায়ী সেই মুমূর্ষু বৃদ্ধটির মুখের দিকে একটিবার মাত্র চাহিয়াই তিনি চলিয়া আসিলেন। রোগী-নিবাসের সামনেই সুদীর্ঘ একটা দালান। ঘর হইতে বাহির হইয়া গাঙ্গুলী মহাশয় সবেমাত্র সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময় বদরীনারায়ণ ঝড়ের মত বেগে ছুটিয়া আসিয়া একেবারে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আর্ত্তস্বরে ডাকিল: 'বাবুজী!'

গাঙ্গুলী মহাশয় স্তব্ধ হইয়া তাঁহার দিকে চহিয়া রহিলেন। মাড়োয়ারী শেঠজী গাঢ়স্বরে বলিল: "মেহেরবানি কোরিয়ে ঐ বুড্ঢা আদমীর সাথে একবার মুলাকাৎ ভ কোরতে হোবেক বাবু সাহেব। হামি বুঝিয়াছি আপিলোক হামিলোককে দেখেই, গোঁস্সা করে তুরন্ত পালিয়ে আসিয়েছেন। লেকেন হামি শুনিয়াছি, আপিলোক উনিলোকের জান মান বাঁচিয়েছেন। উনিলোকের মর্জী বাবুজী—আসেন—আসেন"—বলিয়াই

বদরীনারয়াণ বিস্মিত গাঙ্গুলী মহাশয়ের হাতখানি ধরিয়া পুনরায় ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া চলিলেন। গাঙ্গুলী মহাশয় আপত্তি করিবার অবসরও পাইলেন না, প্রয়োজনও বুঝিলেন না।

তখনও বৃদ্ধের বাক্‌শক্তি ফিরিয়া আসে নাই। গাঙ্গুলী মহাশয়কে দেখিবামাত্র দুই চক্ষু তাঁহার জলে ভরিয়া গেল। হাতদুট তখনও ব্যাণ্ডেজ করা ছিল, হাত তুলিতে না পারিলেও দুই চক্ষু ও কম্পিত ওষ্ঠ, নীরবে যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল, তাহা কাহারও দুর্ব্বোধ্য ছিল না।

বদরীনারায়ণ মাড়োয়ারী গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুইটি হাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে বলিতে লাগিল: বাবুজী, ইনি আমার শশুর আছেন। হাল তবিয়ত ত এনার দেখতে পাচ্ছেন। এতোক্ষণ তো আন্ধারকা ভিতরমে ঘুসিয়েছিলো—আপিলোক আসতেই তো সব খোলসা হোয়ে গিল বাবুজী! যো কাম আপিলোক মেহেরবানিতে করিয়েছেন, বাপুজী ইসারাতে বিলকুল তো বাতলে দিলেন, বাবুজী। এখোন ত আমিলোকের দিলকা হাল শোনেন—আমিলোকের ইস্ত্রী ছেলিয়ার পাত্তা বিলকুল আপিলোকের মালুম আছে, বাবুজী।

গাঙ্গুলী মহাশয় নিজের বিস্ময় ভাব কষ্টে সংযত করিয়া সহজ কণ্ঠেই উত্তর দিলেন: তাঁদের জন্য আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আমি যদি তাঁদের কাছে সঠিক ঠিকানা আপনার পেতুম, তাহ'লে সেই দুর্য্যোগ মাথায় করেই আপনার বাড়ীতে পৌঁছে দিতে পারতুম। কিন্তু আমার স্ত্রীর কাছে তিনি আপনার যে নাম বলেছিলেন, সে তো…

বদরীনারায়ণ বলিল: সে নামের সাথে ত আপনার জান পহান নেই, বাবু সাহেব! আমিলোকের ঘর গেরস্তিসে এক নাম, লেকেন কার কারবারসে আলাদা নাম চালু হোয়—এই দস্তুর; এখন হামার আরজী তো শোনেন!

অতঃপর যে আরজী বদরীনারায়ণজী গাঙ্গুলী মহাশয়কে শোনাইল তাহার মর্ম্ম এই যে— শিবরাত্রির উৎসবকে উপলক্ষ করিয়া বদরীনারায়ণের স্ত্রী ও বালক-পুত্র পিতার সহিত বিকানীর থেকে রওনা হইয়াছিলেন। রওনা হইবার দুই দিন আগেই চিঠি দিয়াছিলেন। তারপর আগ্রা ষ্টেশন থেকে এক তারও করিয়াছিলেন। সেই চিঠি ও তার দাঙ্গার দরুণ এতদিন বিলি হয় নাই। আজ সকালে সেই তার ও চিঠি এক সঙ্গে পাইয়াছেন। এমনই অবস্থায় যাঁরা যাঁরা পড়িয়াছিলেন, হাসপাতালে খবর নেওয়া ভিন্ন আর উপায় ছিল না। বদরীনারায়ণকেও সেই পন্থা অবলম্বন করিতে হয়। তিনি প্রথমে গোধুলিয়ার মাড়োয়ারী হাসপাতালে সন্ধান করেন, সেখানে নিরাশ হইয়া সরকারী হাসপাতালে আসেন। এখানে শ্বশুরজীকে দেখিয়াই যেন আসমান হইতে পড়িয়া যান। একটি ঘণ্টা তাঁহার কাছে বসিয়া ব্যাপারটির কতকটা জানিতে পারেন। তারপর গাঙ্গুলী মহাশয় উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়াই শ্বশুরজী জানান যে, এই বাঙ্গালী বাবুর কৃপাতেই তাঁহারা রক্ষা পাইয়াছেন। বাবুজী ত চলিয়া গেলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই তোমার স্ত্রী কন্যার খবর দিবেন। বৃত্তান্তটি শুনাইয়া দিয়াই বদরীনারায়ণ গাঙ্গুলী মহাশয়ের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল : বাবুজী, হামি আপনাকে আর কি বলিবে—আমিলোক তো আপিলোকের সর্ব্বনাশ করিয়েছি— সেই দুখ মালুম হতেই না আমিলোককে দেখে নারাজ হোয়ে চলিয়ে যান— বাপুজী বুঢ্‌ঢা আদমী হোলে কি হোবে— আপিলোকের মুখ দর্শন হোতেই চিনিয়েছিল ; তাইনা লিয়ে আসতে ইসারা কোরলেন। হালচাল দেখিয়ে বাপুজী বুঝেছিল আমিলোকের দিল যে—আপিলোক বাবুজী—আপিলোক আমিলোকের জরু বাল বাচ্ছা রক্‌সা করিয়াছেন—

মাড়োয়ারী মহাজনের আর্ত্তস্বরে অভিভূত হইয়া গাঙ্গুলী বলিলেন :

রক্ষা করবার মালিক যিনি, তিনিই রক্ষা করেছেন। আমি তাতে উপলক্ষ হয়েছি মাত্র। যাক, এখন আপনি আমার বাসায় চলুন, তাঁরা অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন।"

মাড়োয়ারী মহাজন বদরীনারায়ণ বাসার বাহিরের ঘরখানিতে উঠিয়াই সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল: আরে বাবুসাহেব, এ তো বড়ি তাজ্জব মালুম হোচ্ছে—য্যায়সা নোংরা বস্তীর অন্দরে ঘুসিয়ে আপিলোক বাসা নিয়েছেন—ছো! ছো!

গাঙ্গুলী মহাশয় অবিচলিতস্বরে বলিলেন: নারায়ণজী এখন এখানেই এসে ফেলেছেন বটে! অদৃষ্টের ফেরে এই খোলার ঘরই আমার গরীবখানা। আর ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এই ভেবে শেঠজী, এখানে বাসা পেতেছিলুম বলেই গত দুর্দিনে আপনার মতন রইস আদমার মান মর্য্যাদা রক্ষা করা সম্ভব হয়েছিল।

বদরীনারায়ণ এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল। তারপর গাঢ়স্বরে বলিল: বাবু সাহেব, আমিলোক তো বুড়বাকের সামিল হয়ে ও বাত বলিয়েছে—মাপ কিজিয়ে। লেকেন, আপিলোক হামার জরুর জান মান রক্‌সা করিয়ে তার বাপ হয়েছেন, সে ত আপনার মেয়ে বনিযে গিয়েছে। লেকেন, এথোন থেকে আপিলোক আমারও বাবা হোয়েছেন বাবুজী!

গাঙ্গুলী মহাশয় মেয়েকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন: ওঁদের বল, বদরীনারায়ণজী এসেছেন—তাঁদের সঙ্গে দেখা করবেন।

একটু পরেই গাঙ্গুলী মহাশয়ের মেয়ে ফিরিয়া আসিয়া বলিল: আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে বদরীনারায়ণ বাহিরের ঘরে আসিয়াই গাঙ্গুলী মহাশয়ের দুই পা চাপিয়া ধরিয়া গাঢ়স্বরে বলিল: বাবু সাহেব, আমিলোককে বাঁচান তো—

অতিকষ্টে বদরীনারায়ণের করবেষ্টনী হইতে পা দুখানি মুক্ত করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন : করেন কি, শেঠজী, উঠুন উঠুন আপনি !

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বদরীনারায়ণ বলিতে লাগিল : মেরাকুলোকের পাস তো বিলকুল খবর শুনে নিয়েছি বাবুজী, আউর আপনকার চক্ষুসে আমি লোক যা দেখিয়েছে, তাতে মালুম তো হোয় বাবুজী আপিলোক দেওতা আছেন. আর আপনার ইস্ত্রী তো স্বয়ং মহামায়ী অন্নপূর্ণাজী। আমিলোকের আওরতদের ইজ্জত বাঁচিয়েছেন, আশ্রয় দিয়েছেন, সম্পদ রকসা করিয়েছেন। ঐ তোরঙ্গটির ভিতরেই নোটে আর নগদ টাকায় কেতো আছে মালুম হয় বাপুজী—পঞ্চাশ হাজার……

ঈষৎ হাসিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন : সে আমি জানি। মা-লক্ষ্মী—আপনার স্ত্রী—নিজেই তা বলেছিলেন যে। আর, সেই জন্যেই আমার ভাবনা বেশী হয়েছিল, বদরীনারায়ণজী ! এখন নারায়ণজী আমার মুখ রক্ষা করেছেন।

দুই হাত যোড় করিয়া, আর্তস্বরে বদরীনারায়ণ এবার বলিল : এখন ত আমিলোকের আরজী আপিলোক রখি-া করেন, বাবুজী, লেকেন আমিলোক এ মোকাম ছোড়কে উঠবে না।

নির্মল দৃষ্টি বদরীনারায়ণের মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন : আগে বলুন ত—

বদরীনারায়ণ বলিতে লাগিল : আপিলোকের সাবেক মোকাম ত খালি পড়িয়ে রয়েছে, কোই আদমী লোক ও মোকাম কেরায়া লিতে রাজী হোয় না। এখন বাবুজী নিজ মোকামে ফিন দৌলতখানা বানিয়ে আমিলোককে ছুটি তো দেন।

স্নিগ্ধ দৃষ্টি বদরীনারায়ণের মুখে নিবদ্ধ করিয়া সহজ কণ্ঠে গাঙ্গুলী মহাশয় উত্তর করিলেন : সে বাড়ী পড়ে আছে শুনিছি শেঠজী ! আমরা

উঠে আসবার পর কেউ ভাড়া নেয়নি, বাইরের কেউ ভাড়া নিতে গেলেও তাদের নাকি নিষেধ করা হয়। কথাটা শুনে অবধি আমি সত্যিই বেদনা পেয়েছি, আর আপনি বিশ্বাস করুন—আমি নিজেও অনেক চেষ্টা করেছি যাতে পড়শীরা অপরকে বাধা দিয়ে আপনার ক্ষতি না করেন।

অধৈর্য্যভাবে বদরীনারায়ণজী বলিয়া উঠিল : সে খবরও আমিলোক শুনেছিলো বাবুজী, লেকেন বিশ্‌শোয়াস করেনি; ভেবেছিল—আপি-লোকের কারসাজি হোবেক।

সহাস্যে গাঙ্গুলী মহাশয় বলিলেন : এখন ত বিশ্বাস হয়েছে শেঠজী—যে আমার কারসাজী ও ব্যাপারে কিছু ছিল না? যা হোক, আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, যাতে ওবাড়ীর ব্যাপারে পড়শীরা কোন রকম গোল বাধাতে না পারে তার ব্যবস্থা আমি করবো। আপনি ভাড়াটে ঠিক করুন।

গম্ভীরমুখে এবং দৃঢ়স্বরে শেঠজী বলিল : নয়া ভাড়াটে তল্লাস করবার হাঙ্গামা চুকিয়ে দিচ্ছি, বাবুজী! ও মোকাম দেওতার স্থান আছে, দোসরা কই মামুলী লোক ও মোকামে ঘুসবে না, বাবুজী। কালই আমিলোক আদালত থেকে কোয়ালা রেজষ্টারী করিয়ে আপিলোকের গোড়ে নজর দেবে—

শেঠজী সোৎসাহে আরো কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু গাঙ্গুলী মহাশয়ের প্রসন্ন সরল মুখখানার আকস্মিক পরিবর্তন চোখে পড়িতেই মুখের কথা তাঁর তৎক্ষণাৎ বন্ধ হইয়া গেল। এই বাঙালী বাবুটির মুখে এরূপ কঠিন ভঙ্গি এবং দুই চক্ষুর অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন শেঠজীর দৃষ্টিতে এমন তীব্রতর হইয়া ভীতির সঞ্চার করে নাই। এমন কি, যে দিন পাওনা টাকার তাগাদায় গাঙ্গুলী বাবুর গদীতে স্বয়ং হানা

দিয়া সর্বসমক্ষে তাঁহাকে রূঢ় ভাষায় অভদ্রের মত আঘাত করিয়াছিল, সেদিনও অপমানাহত প্রতাপ গাঙ্গুলীর মুখখানা এভাবে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে নাই। সে দৃষ্টির জ্বালা যেন সহ্য করিতে না পারিয়াই শেঠজী রুদ্ধকণ্ঠে স্তব্ধভাবে সামনের অদ্ভুত মানুষটির পায়ের দিকেই নিজের দুই চক্ষুকে নত করিল।

পরক্ষণেই আত্মসংবরণ করিয়া গাঙ্গুলী মহাশয় গম্ভীরমুখে কহিলেন: সত্যিই আমি আশ্চর্য। হচ্ছি এই ভেবে, শেঠজী, আপনার মতন হিসিবী মানুষের মনে এত বড় একটা গলদ কি করে ঠাঁই পেল! এর আগে ত এমন ভুল করতে আর কোন দিন দেখিনি, শেঠজী! দেনার জন্যে নালিশ করে আদালতের সাহায্য নিয়ে আমার বাড়ী যখন আপনি নিলেমে ডেকে নিয়েছিলেন, তার জন্যে কোন দিন ত আমি আপনাকে দোষী বা বেহিসিবী মনে করিনি—বিষয়ী মানুষের মতই কাজ করেছিলেন সেদিন। কিন্তু আজ আমার দুর্দিনে ঘটনাচক্রে আমার ওপর খুশি হয়ে সে বাড়ীখানা আমাকে খয়রাৎ করতে যে চাইছেন—আপনার এই ইচ্ছাটাই আজ আমাকে এমনি আঘাত দিয়েছে, যেটা বরদাস্ত করা আমার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠেছে।

শেঠজীর মুখখানা এতক্ষণে ছায়ের মত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কষ্টে একটি ঢোঁক গিলিয়া গলাটা সরস করিয়া ধীরে ধীরে বলিল: রাম-রাম-রাম! আপিলোককে খয়রাৎ কোরে নাম জা'হর কোরবে—আমিলোকের দিলমে য্যায়সা কুছ ইচ্ছা পয়দা হোয়নি বাবুজী—হাঁ, মতলব আমিলোক করিয়েছিল—না বাবুজী ঝুট বাত আমি বলেছে। আমি-লোকের মেহারলোক ইচ্ছা করিয়েছিল—ও মোকাম মাইজী লোকের গোড়মে নজর দিবে—

শেঠজীর কথার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরের রুদ্ধ দরজাটি খুলিয়া গেল এবং

পরক্ষণে বদরীনারায়ণের পত্নীকে লইয়া নারায়ণী ঘরখানির মধ্যে প্রবেশ করিল। শিশুটি মাতৃক্রোড়ে ঘুমাইতেছিল।

বদরীনারায়ণের প্রস্তাবটির উত্তর আর গাঙ্গুলী মহাশয়কে দিতে হইল না। সংকোচশূন্য স্নিগ্ধস্বরে নারায়ণীই বলিল: দেখুন শেঠজী, এঁর সঙ্গে আপনি দেখা করে আসবার পরেই আমার এই মেয়েও ঠিক ঐ জেদ ধরেছিলেন। আমাদের বসতবাড়ী দেনার দায়ে আপনিই কিনেছেন, তারপর আমরা এই খোলার বাড়ীতে বাস করছি—একথা আপনার মুখে শুনে অবধি এঁর আর মনোকষ্টের অন্ত নেই। আমরা যাতে ঐ বাড়ীতে গিয়ে বসবাস করি তার জন্যে শুধু মুখের সাধ্য-সাধনা নয়—মাথা পর্য্যন্ত খুঁড়েছেন আমার সামনে। তখন অনেক করে বুঝিয়ে দিতে মেয়ে আমার বুঝতে পেরে ও সংকল্প ত্যাগ করেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, শেঠজী, সর্বহারা হলেও আমরা মনুষ্যত্বটুকু আজো হারাইনি বলেই আপনাদের ও দান ঠিক মনে ধরছে না। তুচ্ছ একখানা বাড়ী দিয়ে আপনি আমাদের ভোলাতে চাচ্ছেন শেঠজী, যে বাড়ীখানা পড়েই আছে—ওতে ত আমাদের মন ভরবে না।

নারায়ণীকে দেখিয়াই শেঠজী উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল; এই শুদ্ধবাক্ বাঙ্গালী মেয়েটির কথাতেই বুঝিয়াছিল যে তিনিই গৃহস্বামীর সহধর্ম্মিণী। কথা তাঁর ফুরাইতেই হাত দুখানি যোড় করিয়া সে বলিল: হামার স্ত্রীকে যেখোন মেয়িয়া বলিয়েছ মায়ী, তুমিলোক আমারও মায়ী আছে। যেখোন মায়ীর হুকুম হোক কোন্ দৌলত উৎসর্গ আমিলোক করিলে মায়ীলোকের দিল ভরপুর হোবে? আমিলোক কসম—

গাঢ়স্বরে নারায়ণী বলিল: কসম করবার দরকার নেই, শেঠজী, আমিই বলছি, আমাদের জন্মজন্মান্তরের ভাগ্যের জোরেই এই ভাঙা বাড়ীতে এসেছে আমাদের মেয়ে জামাই আর নাতী। নিজের ছেলে

মেয়েরা সব ছোট, কবে যে এদের সাদী হবে তা জানিনে। কিন্তু তার আগেই প্রসন্ন হয়ে ভগবানজী সে সাধ মিটিয়ে দিয়েছেন। এখন আপনিই বলুন, শেঠজী, মেয়ে-জামায়ের কাছ থেকে কোন্ দৌলত বাপ-মা নিতে পারে—যাতে তাদের দিল ভরে ওঠে, আর সম্বন্ধ ঠিক বজায় থাকে?

বদরীনারায়ণজী মাথার টুপিটায় হাত রগড়াইতে রগড়াইতে বলিল: তাইতো মা-জী, আপিলোক তো বহুত ধোঁকার মাঝে ফেলিয়ে দিলেন…

শেঠজীর স্ত্রী এই সময় দীর্ঘ অবগুণ্ঠনটি ঈষৎ মাথার দিকে তুলিয়া মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিল: মাজী তো সমঝায় দে দিয়া এক চীজ হ্যায় দুনিয়ামে, উ হোয়—ভকতি।

সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণী বদরীনারায়ণজীর পত্নীর উক্তিটার সমর্থন করিয়া বলিল: এই ভক্তি ছাড়া আমরা ত আর কিছু নিতে পারিনে, শেঠজী, মোকাম নয়—ধন-দৌলতও নয়। আমরা যখন অদৃষ্টের ফেরে বাপ হয়েছি, মা হয়েছি, তখন আমাদের ওপর ছেলে মেয়ের এই শ্রদ্ধাভক্তি বজায় থাকলেই আমাদের দিল ভরে যাবে। আর ভগবান যদি সহায় হন, আমাদের নিয়তি শুদ্ধ থাকে, তাহলে বাড়ী ফিরিয়ে নেবার ব্যবস্থা তিনিই করে দেবেন। এইটুকুই আমরা সার বুঝিছি, শেঠজী. বাইরের কায়-কারবারে আদান প্রদানে চাই পয়সা, কিন্তু মন নিয়ে যেখানে কারবার, তার ধন-দৌলত আলাদা, সে হচ্ছে শ্রদ্ধা, ভক্তি আর ভালবাসা।

শেঠজী অভিভূতভাবে এই মহিয়সী মহিলার কথাগুলি শুনিতেছিল, শেষের কথা শুনিয়া তাঁর পায়ের কাছে মাথাটি ঠেকাইয়া গাঢ়স্বরে বলিল: কসুর আমার মাফ কর মা-জী—আমিলোক সমঝেছে—বিশ্বনাথজী অন্নপূর্ণাজী কাশীর মন্দির ছেড়ে এই মোকামে আস্থানা লিয়েছেন। কসুর হামার মাপ কীজিয়ে—মাপ কিজীয়ে।

—তিন—

লাহোরনিবাসিনী কতিপয় তরুণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভে অগ্রসর হইয়া সিদ্ধান্ত করে যে, সংসারের সকল সমস্যা সমাধানের পক্ষে পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নহে; কার্যক্ষেত্রে এমন কতকগুলি সাধনায় চিত্তসংযোগ করা উচিত—যেগুলি অপ্রয়োজনীয় বলিয়া শিক্ষিত সমাজে সাধারণতঃ উপেক্ষিত।

এই মেয়েগুলি কেতাবের কীট হইয়া শিক্ষিত সমাজের প্রশংসার জন্য লালায়িত ছিল না, তাহারা প্রগতিপন্থী হইলেও কেবল যে পুরাতনকেই নির্বিচারে স্বীকার করিতে চাহিত না, এরূপ নহে। যাহা কিছু নূতন দেখিত, অন্ধভাবে তাহারও সমর্থন করিত না এবং সকল সঙ্কোচ, দুর্বলতা ও নারীসুলভ আড়ষ্টতার প্রভাব কাটাইয়া বর্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্যই ইহারা বর্তমানের প্রয়োজন উপলব্ধি করিত। গ্রন্থলব্ধ জ্ঞানই যথেষ্ট মনে না করিয়া মানুষের সহিত অসঙ্কোচে আলাপ করিয়াও ইহারা মানুষের ভিতরটা জানিবার চেষ্টা করিত, মনস্তত্ত্বে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য গ্রন্থের সাহায্যে কল্পনা-জগতে বিচরণের পরিবর্তে বাস্তব-জগতে মানুষের মন লইয়াই গবেষণা করিত, এবং বাস্তবকে বিশ্লেষণ করিয়া চিনিবার চেষ্টা করিত।

এই প্রকার সাধনার ফলে এই মেয়েগুলি সব দিক দিয়াই সঙ্কোচহীন হওয়ায় কোনরূপ অন্যায়কেই স্বীকার করিতে চাহিত না, এবং কাহাকেও কোন অবৈধ বা আপত্তিকর কার্যে লিপ্ত দেখিলে ইহারা দলবদ্ধভাবে বা অবস্থানুসারে নিঃসঙ্গ হইয়াই তাহার প্রতিবিধানে অগ্রসর হইত। শক্তি-চর্চার ফলে ইহাদের দেহ অত্যন্ত সুদৃঢ় হইয়াছিল, এজন্য হঠাৎ আক্রান্ত হইলে ইহাদের কেহই ভয়ে আড়ষ্ট হইত না, বরং আততায়ীকেই আড়ষ্ট

করিয়া ছাড়িত। চরিত্র-গঠনে সংযম এবং মনের বল ইহারা সযত্নেই সঞ্চয় করিয়াছিল। এই গুণ গুলির উপর ইহাদের উপস্থিত বুদ্ধিও অত্যন্ত প্রখর ছিল। এই সকল কারণে কলেজের ডাংপিটে ছেলেরাও ইহাদিগকে সমীহ করিয়া চলিতে বাধ্য হইত।

এই মেয়ে-দলটির পরিচালিকার নাম শ্রীমতী আশা, এবং এই তরুণীই আমাদের এই কৌতূহলোদ্দীপক আখ্যায়িকাটির কেন্দ্রস্বরূপিণী। যে দলের কোন মেয়েই উপেক্ষণীয় নহে,সেই দলটী যাহাকে নেত্রীর মর্য্যাদা দান করিয়াছে, সে যে শক্তি-সামর্থ্যে ও বুদ্ধি-কৌশলে দলের সকলেরই শ্রেষ্ঠ, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু শুধু ঐ তিনটি বিষয়েই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাপ-কাঠিতেও শ্রীমতী আশা দেবীর স্থান অনেক উর্দ্ধে। কারণ, দুইটি 'সাবজেক্টে অনার্স' লইয়া সে বি.এ. পাশ করিয়াছে, এবং 'ফিজিওলজী' লইয়া এম.এ. পড়িতেছে। আর, নারীর প্রধান গৌরব যে রূপ, সেই গৌরবেরও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অধিকারিণী সে। এই তন্বী তরুণীর স্বাস্থ্য-পুষ্ট নিটোল দেহ, গোলাপ-সন্নিভ সুগৌর বর্ণ, প্রতিভামণ্ডিত নিখুঁত মুখ ও সর্বাঙ্গের লালায়িত লাবণ্য—তাহাকে আদর্শ সুন্দরীতে পরিণত করিয়াছিল। বাঙ্গালীর মেয়ের এই অতুলনীয় সৌন্দর্য বাঙ্গলার বাহিরে রূপ-সম্পর্কেও বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিতেছিল।

আশা দেবীকে দেখিবার জন্য দল বাঁধিয়া হার্ডিঞ্জ কলেজের ছেলেরা প্রত্যহ দুই বেলা কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে গেটের নিকট সমবেত হইত। তাহার সহিত আলাপ করিবার জন্য অনেকেই ব্যাকুল হইয়া উঠিত। হীরা সিং নামক একটি বেতরিবৎ ছাত্র এই তরুণীর অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। এই যুবকটি ছিল কলেজের কলঙ্ক; ছাত্র-ছাত্রীরা তাহাকে দেখিলে আতঙ্কিত হইত। কিন্তু হীরা সিং বহু চেষ্টাতেও আশা দেবীর সহিত ঘনিষ্ঠতা করিতে না পারিয়া, শেষে এক কাণ্ড করিয়া বসিল। একা

দিন কলেজের ক্লাসে এক নিরীহ অধ্যাপকের 'পিরিয়ডে' আশা দেবী যে সময় তাহার পার্শ্ববর্তিনী মেয়েটির সহিত হাসিমুখে কথা কহিতেছিল, হীরা সিং সেই সময় সুযোগ বুঝিয়া চা-খড়ির একটা ডেলা লইয়া আশার ওষ্ঠ লক্ষ্য করিয়া সজোরে নিক্ষেপ করিল। নিক্ষিপ্ত ডেলাটির দ্বারা ওষ্ঠের পরিবর্তে আশা দেবীর বাম গণ্ড আহত হইল, এবং হীরা সিং-এর দুর্ভাগ্যক্রমে আঘাতটি অতর্কিতভাবে হইলেও সে অদৃশ্য হইবার সুযোগ পাইল না। কিন্তু এই অপকর্ম করিয়া সে দমিল না, বরং আঘাত পাইয়া আশা দেবী তাহার মুখের উপর তীব্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেই সে তাহাকে একটা অশ্লীল ইঙ্গিত করিবার প্রলোভন পর্যন্ত সম্বরণ করিতে পারিল না। আশা দেবীকে তৎক্ষণাৎ নিজের 'সীট' হইতে উঠিতে দেখিয়া তাহার সহাধ্যায়িনীরা ভাবিল, সে সেই দুঃশীল ছাত্রের বিরুদ্ধে প্রফেসরের নিকট অভিযোগ করিতে চলিল। কিন্তু আশা দেবীর সেরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। যে বেঞ্চিতে হীরা সিং বসিয়াছিল, সে ক্ষিপ্রগতিতে সে স্থানে উপস্থিত হইয়া হীরা সিংএর গালে এরূপ প্রচণ্ডবেগে চপেটাঘাত করিল যে, তাহার গালে আঙ্গুলগুলির দাগ বসিয়া গেল, তাহার পর সে ধীরে ধীরে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিয়া নিজের সীটে বসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য, অবলার কোমল করের এই আঘাতের তীব্রতা হীরা সিং মর্মে মর্মেই উপলব্ধি করিয়াছিল। ইহার পর আর কোন দিন ক্লাসের কোন ছেলেকে মেয়েদের প্রতি অশিষ্টাচরণের জন্য প্রলুব্ধ হইতে দেখা যায় নাই। এই দিন হইতে কলেজের ছেলেরা আশা দেবীর প্রসঙ্গে বলিত—'গুড্ হোপ'; আর মেয়েরা আশ্বস্তচিত্তে বলিত,—'হোপ অফ দি নেসন!'

আশা দেবী সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। তাহার পিতা ভবতোষচাকলাদার লাহোর হাইকোর্টের বিচারপতির পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। পিতার ও কন্যার প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেক বিষয়েই সামঞ্জস্য ছিল।

কালোপযোগী পরিবর্তন অপরিহার্য মনে করিয়া শিক্ষিত সমাজের আদর্শ স্বরূপ এই বিচক্ষণ বর্ষীয়ান প্রবাসী ভদ্রলোক তরুণী কন্যাকে যে ভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কন্যার প্রগতিশীল চিত্তের অনুকূলই হইয়াছিল। কন্যার প্রতি এরূপ গভীর আস্থা ও বিশ্বাসের জন্য কোন দিনই কিন্তু তাঁহাকে ক্ষুব্ধ হইবার মত কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বন্ধু-সমাজে কন্যার প্রসঙ্গ উঠিলে তিনি ইস্পাতের দৃঢ়তার সহিত আশার চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের তুলনা করিতেন।

কিন্তু মেয়ের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিলেও, তাহাকে পাত্রস্থ করিবার চিন্তা বিবেচক বিচারপতিকে বিচলিত করিয়া তুলিল। ঘটনাচক্রে এই সময় একটা ভাল সম্বন্ধও আসিয়া জুটিল। পাত্রটি ব্যারিষ্টারী পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছিল। অল্পদিন পূর্ব্বে সে কলিকাতা হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস্ আরম্ভ করিয়াছে। পিতা বিবাহের প্রসঙ্গে আশাকে বলিলেন: আমার ইচ্ছা, আগে তুমি ওকে দেখ; তোমার অনুকূল মত জান্‌তে পার্‌লে আমি অগ্রসর হ'তে পারি, মা!

আশা একটু কুণ্ঠিতভাবে বলিল: আমার দেখ্‌বার দরকার নেই, বাবা, আপনি যা করবেন, আমি কি তার সমর্থন না করে পারি? আপনার চেয়ে আমি বেশী বুঝব?

পিতা আপত্তি তুলিলেন: "আমার দেখায় আর তোমার দেখায় অনেক তফাৎ, মা! চিরজীবনের যে অবলম্বন—আশ্রয় হবে, তাকে বুঝতে হবে তোমাকেই; তার যোগ্যতা পরীক্ষা করবে তুমি। স্বামী-নির্বাচনে কন্যার মতের স্বাধীনতা আমি অপরিহার্য মনে করি, এবং করা উচিত।

কন্যা মৌন রহিল, পিতা বুঝিলেন, ইহা সম্মতি-লক্ষণ।

পূজার কিছু পূর্বে চাকলাদার মহাশয় কন্যাসহ কলিকাতায় আসিলেন।

কয়েক দিন উভয়পক্ষের আলাপ-আলোচনা চলিল। পাত্রপাত্রীর পরস্পর পরিচয়েও সুযোগ ঘটিল। কিন্তু তিন দিন পরেই আশা পিতার নিকট বিবাহের অনিচ্ছা জানাইয়া লাহোর প্রত্যাগমনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিল। কলিকাতা তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

পিতা বুঝিলেন, কলিকাতা নয়—ব্যারিষ্টার পাত্রকেই কন্যার ভাল লাগে নাই। কন্যাকে তিনি ভাল করিয়াই চিনিতেন; সুতরাং বিনা প্রতিবাদে সেই দিনই পাত্রপক্ষকে স্পষ্ট জবাব দিলেন। সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল।

চালকদার মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল, ফিরিবার পথে কিছু দিন কাশীধামে কাটাইবেন। এই জন্য বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট অঞ্চলে প্যারাডাইস হোটেলে তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহারা এই হোটেলে উপস্থিত হইলেন।

নন্দলাল রায় অতি প্রিয়দর্শন ও মার্জ্জিত-রুচি যুবক। এই সময় সে প্যারাডাইস হোটেলের একটি বিশেষ অংশ ভাড়া লইয়া মহা সমারোহে একাকী সেখানে বাস করিতেছিল। সে কারণে-অকারণে প্রচুর ব্যয় করায় হোটেলস্থ সকল লোকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এবং অল্প দিনের মধ্যে তাহার নামের পূর্ব্বে 'প্রিন্স' খেতাবটি সংযুক্ত হয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, হোটেলে আসিবার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই 'প্রিন্স' নন্দলালের সহিত জজ-নন্দিনী আশা দেবীর পরিচয় এরূপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইল, যেন তাহারা পরস্পর কত দিনের পরিচিত!

আশা দেবী নিজেই নন্দলালকে লইয়া গিয়া তাহার পিতার সহিত পরিচিত করিল। তাহার পিতা পূর্ব্বেই এই 'প্রিন্স' সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ পাইয়াছিলেন। তাহার সহিত পরিচয় হওয়ায় তাহার করমর্দ্দন করিয়া হাসিয়া বলিলেন: তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রে আমার আনন্দ হচ্ছে এই

জন্য যে, তুমিও বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলা দেশের এক বিশিষ্ট জমিদার-বংশে তোমার জন্ম। কিন্তু তোমার অসঙ্গত অপব্যয়ের পরিচয় পেয়ে আমি সুখী হ'তে পারিনি। তোমরা মিতব্যয়ী হও, ইহাই আমি প্রার্থনীয় মনে করি।

মৃদু হাসিয়া নন্দলাল উত্তর দিল: বেশ; আপনি আমার পিতৃতুল্য ব্যক্তি, আপনার এ আদেশ আমি পালনের চেষ্টা ক'রব, তবে অনেক দিনের অভ্যাস কি না, তা ত্যাগ ক'র্‌তে কিছু সময় লাগবে।

হোটেলের সর্বোৎকৃষ্ট মোটর-কার নন্দলালই দিবারাত্রির জন্য বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। সে প্রসঙ্গক্রমে জজ-সাহেবকে বলিল: হোটেলের গাড়ী পেতে অসুবিধা হ'লে আমার গাড়ী আপনারা ইচ্ছামত ব্যবহার ক'র্‌বেন। আমার তাতে ভারী আনন্দ হবে।

প্রস্তাবটা প্রথমে জজ-সাহেবের প্রীতিকর না হইলেও ঘটনাচক্রে গাড়ীর অভাবে সেই দিনই তাঁহাকে নন্দলালের বন্দোবস্ত-করা মোটর ব্যবহার করিতে হইল। বিশ্বনাথ-দর্শনে যাত্রা পথে আশা মুক্তকণ্ঠে নন্দলালের যেরূপ অজস্র প্রশংসা করিল, তাহা শুনিয়া তাঁহার মনে হইল, তাহাদের কলিকাতা গমনের যে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে, কাশীতে বাবা বিশ্বনাথ কি তাহা সফল করিবেন?

একদিন নন্দলালের প্রসঙ্গে আশার পিতা তাহাকে বলিলেন: "নন্দলালের এই রকম নবাবী চাল সমর্থনের অযোগ্য; বাঙ্গালা দেশের জমিদারগুলো এই রকম অপব্যয়েই উৎসন্নে যাচ্ছে।"

আশা পিতার উক্তির সমর্থন করিয়া বলিল: "হাঁ, বাবা, সেই জন্যই ঐ পথ থেকে এদের ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন হয়েছে।"

কন্যার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য চাহিয়া বিজ্ঞ বিচারপতি বুঝিলেন,

এত দিনে কন্যার হৃদয়াকাশে অরুণোদয় হইয়াছে ; কিন্তু প্রভাতেই তাহা মেঘাবৃত হইবে কি না, বাবা বিশ্বনাথেরই তাহা সুগোচর।"

ঘনিষ্ঠতা ক্রমশঃই নিবিড় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়াছে। আশা দেবী নানা সূত্রেই জানিতে পারিয়াছে, এই অপব্যয়ী যুবকটির অনেকগুলি দুর্লভ গুণ আছে ; তাহার বলিষ্ঠ দেহের মত মনটিও সুস্থ এবং পরিপুষ্ট।

সেদিন জৌনপুর হইতে ফিরিবার পথে নন্দলাল হাসিমুখে প্রশ্ন করিল : "ট্রিপটা কেমন লাগলো ?"

অপ্রসন্ন মুখে আশা উত্তর করিল : "ছাই !"

নন্দলাল কহিল :" আমি বরাবরই দেখ্‌ছি, রাজপথের ওপর আপনার দারুণ বিরাগ।"

আশা দেবী কলকণ্ঠে কহিল : "ঠিক ধরেছেন, এর চেয়ে বনপথ ঢের ভালো।"

নন্দলাল কণ্ঠে জোর দিয়া কহিল : "কিন্তু সারনাথও আপনার ভালো লাগেনি। প্রাচীন যুগের অমন যে মৃগদাব—আপনার মনের ওপর একটুও দাগ টানতে পারে নি।"

আশা মাথা নাড়িয়া প্রত্যুত্তর দিল : "প্রাচীন নামটাই সেখানে শুধু বজায় আছে,—বনের চিহ্ন কিছু দেখেছেন ?"

নন্দলাল এবার সকৌতুকে সঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল : "বনের ওপর যখন আপনার এতই লোভ, বনভ্রমণের আয়োজন আমি ক'রতে পারি, তবে যদি আপনার সাহসে কুলোয়।"

আশা ঈষৎ হাসিয়া কহিল : "বনের সন্ধান যদি আপনি দিতে পারেন, আর সঙ্গে থাকেন, বনের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত আমি পাড়ি দিতে পারি।"

নন্দলাল কহিল: "বেশ, আপনি তা'হলে প্রস্তুত থাকুন, কাল আপনাকে বনের খবর দেব।"

আশা কৌতূহলাবিষ্ট দৃষ্টিতে নন্দলালের দিকে চাহিয়া কহিল: "কিন্তু দেখবেন, সেটা যেন ঠিক বনভোজনের বন না হয়,—বন বল্‌তে যা বুঝায়, আর বনের বাসীন্দাগুলাও সেখানে চাই—বুঝ্‌লেন?"

নন্দলাল উত্তর দিল: 'বুঝেছি; কিন্তু মোটর সেখানে অচল।"

আশা মৃদু হাসিয়া রহিল: "আমরা বেরুবো য়্যাড্‌ভেঞ্চারে—মোটরকে বর্জ্জন করে।"

মোটরের সোফার লালচাঁদ বরাবর ষ্টিয়ারিংয়ে তাহার হাত দুইখানি রাখিয়া কাণদুটি এই দুই তরুণ-তরুণীর কথোপকথনেই নিবিষ্ট রাখিয়াছিল। ইহাদের সব কথা যদিও সে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আলোচনার সারমর্ম্মটুকু উপলব্ধি করিতেও তাহার কষ্ট হয় নাই। সে প্যারাডাইস হোটেলের মালিকের বেতনভুক্ ভৃত্য, এ কথা বলা চলে না। কারণ, এ গাড়াখানি হোটেলের কাযের জন্য ভাড়া করা এবং হনুমানপ্রসাদ নামক এক জমিদার এই গাড়ীর মালিক। গাড়ীর সহিত সোফার লালচাঁদকেও সে হোটেলের কার্য্যে সমর্পণ করিয়াছে। সিক্রোল অঞ্চলে হোটেলের সন্নিকটেই চৌকাঘাট নামক মহল্লায় হনুমানপ্রসাদের বাগান-বাড়ী। সোফার লালচাঁদ সকাল সাতটার সময় মনিবের গ্যারেজ হইতে গাড়ী লইয়া হোটেলের দরজায় উপস্থিত হয় এবং হোটেলের এই বিশিষ্ট 'রইস' লোকটির নির্দ্দেশমতই গাড়ী চালায়। হোটেলের আফিসে কাযের রিপোর্ট লিখাইয়া দিয়া লালা লালচাঁদ চৌকাঘাটের বাগানে উপস্থিত হইল। হনুমানপ্রসাদ তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিল।

লালচাঁদ হাসিমুখে কহিল : "আজ তোমার খুবসুরৎ পিয়ারীর দিলের খবর পেয়েছি।"

হনুমানপ্রসাদের চোখ দুইটি চক্-চক্ করিয়া উঠিল, দৃষ্টিতে প্রশ্ন ভরিয়া সে লালচাঁদের দিকে চাহিল।

লালচাঁদ কণ্ঠের স্বর কিঞ্চিৎ মৃদু করিয়া কহিল : "সহর বনারসে তাঁর মন বসছে না, বেড়ায় ধুলো কি না, দিল তাই ময়লা হয়ে গেছে। তিনি চান জঙ্গল দেখ্‌তে, তার সাথী কথা দিয়েছে দেখাবে।"

মনের আনন্দ মনে চাপিয়া সকৌতুকে হনুমানপ্রসাদ কহিয়া উঠিল : "বল কি? জঙ্গলে যেতে চায়! আরে জী, চাকিয়া জঙ্গলের বাদশা ত এখানে হাজীর রয়েছে! মহারাজার জঙ্গল রক্ষার ভার ত আমার ওপরেই আছে। কিছু বাতলেছ না কি?"

লালচাঁদ গম্ভীর মুখে জানাইল : "আগে সলা ঠিক না ক'রে কিছু বল্‌বার মত বোকা আমি নই। নবাব আমাদের ভালই বলতে হবে, তবে রাতারাতি রাস্তা তৈরী করা চাই।"

দীর্ঘরাত্রি পর্য্যন্ত অতঃপর উভয়ের যে পরামর্শ চলিল ও সেই সম্পর্কে যে রাস্তা 'পাকা' হইয়া গেল, তাহারই সূত্র ধরিয়া পরদিন প্রত্যূষে লালচাঁদ হোটেলে নন্দলালের ড্রয়িংরুমের দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন নন্দলালের প্রাতরাশ চলিয়াছে, হোটেলের দুই জন খানসামা তাহার তদ্বিরে হিমসিম খাইতেছে।

সুযোগ বুঝিয়া লালচাঁদ দ্বারপথে দোদুল্যমান পর্দ্দাটি ঠেলিয়া মাথাটি বাড়াইয়া দিল। নন্দলালের সহিত চোখোচোখি হইতেই সে আভূমি নত হইয়া মোগলাই কেতায় কুর্ণিশ করিল। নন্দলালের নির্দেশমত প্রত্যহই এই সময় হোটেলের হাতায় মোটর বাহির করিয়া তাহাকে প্রস্তুত থাকিতে

হয়। আজ সে হুকুম পাইবার পূর্বেই সাহস করিয়া নন্দলালের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত।

সোফারকে দেখিয়া নন্দলালের মুখখানা প্রসন্ন হইয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হইল: "গাড়ী বার ক'রেছ ?"

পুনরায় নতভাবে কুর্ণিশ করিয়া লালচাঁদ উত্তর দিল: "জী, হুজুর!"

চায়ের পিয়ালায় একটা চুমুক দিয়া নন্দলাল তীক্ষ্নদৃষ্টিতে সোফারের পানে চাহিল।

লালচাঁদ করযোড়ে কহিল: "হুজুর কোন্ দিকে আজ সফর ক'রবেন ?"

পিয়ালায় আর একটা চুমুক দিয়া হুজুর সহসা জিজ্ঞাসা করিল: "সারনাথে তুমিই আমাদের নিয়ে গিয়েছিলে না ?"

—"জী' হুজুর !"

—"সারনাথের মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে কত দূরে গেলে জঙ্গল মিল্‌বে বল্‌তে পারো ?"

—"ওদিকে ত ভারি জঙ্গল নেই, হুজুর! বিলকুল বস্তী আর আম-আমরুতের বাগিচা। আজমগড় তক্ গেলে কিছু কিছু জঙ্গল মিল্‌বে।"

—"বড় জঙ্গল কাছাকাছি কোথাও নেই ?"

—"কেন থাক্‌বে না, হুজুর! বনারসে যা নেই, সারা দুনিয়াও তা নেই। কাশীনরেশের চাকিয়ার জঙ্গলের মত ভারি জঙ্গল ইণ্ডিয়ার কোথাও আছে ?"

কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই নন্দলাল সহসা সোজা হইয়া বসিল। মনে মনে খুশী হইয়া সে কহিল: "তুমি সে জঙ্গল জানো? গিয়েছ কখনো ?"

লালচাঁদ সবিনয়ে উত্তর দিল: "জরুর। কত আংরেজ লোক, কত সব মেম-সাব আমার গাড়ীতে সেই জঙ্গলে গিয়েছে, তার ঠিকানা নেই।"

বিস্ময়ের সুরে নন্দলাল জিজ্ঞাসা করিল: "গাড়ী যায় সেখানে? বল কি হে?"

লালচাঁদ জানাইল: "কাশীনরেশ ঐ জঙ্গলে হামেসা শিকার করতে যান কি না, তাই জঙ্গলের ভেতর খানিক দূর পর্য্যন্ত বাঁধা সড়ক আছে। আরও ভেতরে যেতে হ'লে হাতীতে চেপে যেতে হয়। হাতীও সেখানে ভাড়া পাওয়া যায়।"

হাতীর কথা শুনিয়া প্রিন্সের মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল। সোফারের মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আগ্রহের সুরে এবার সে জিজ্ঞাসা করিল: "আচ্ছা, এখনই যদি আমরা বেরুই, জঙ্গলটা মোটামুটি রকমে দেখিয়ে কখন তুমি ফিরিয়ে আনতে পার? অবশ্য, তার ভেতর আমরা ঘণ্টাখানেক হাতী চড়েও ঘুরবো।"

লালচাঁদ মনে মনে হিসাব করিয়া উত্তর দিল: "কত আর সময় লাগবে হুজুর, সাঁঝের বাত্তি জ্বাল্‌বার আগেই আমরা হোটেলে ফির্‌তে পারবো। তবে একটা কথা আছে, হুজুর—"

হুজুর জিজ্ঞাসু-দৃষ্টিতে চাহিতেই সে তাহার শেষের কথাটা এইভাবে জানাইল: "এখুনি বেরুলে হয় ত হুজুরদের একটু অসুবিধায় পড়তে হবে। কেন না, জঙ্গলে যাবার পাস, হাতী-মাহুত, লোক-জন, হুজুরদের খানা-পিনা এ সব আগেই যোগাড় ক'রে রাখা দরকার। হুজুর যদি আমাকে আজ ছুটি দেন, সব বন্দোবস্ত ক'রে ও-বেলায় ফিরে আসতে পারি। তাহলে কাল সকালেই বেরুনো চলে।"

মনে মনে কি ভাবিয়া অগত্যা এই প্রস্তাবেই নন্দলাল সায় দিয়া লালচাঁদকে কহিল: "বেশ, তা'হলে আজ আর আমি বেরুব না। আর

দেখ, আমরা চুপিচুপিই যাব, আর চুপিচুপিই ফিরবো। এ খবর চাপা রাখা চাই।”

লালচাঁদ মাথা নত করিয়া জানাইল: “তাই হবে, হুজুর।”

হুজুর তখন একটুকরা কাগজে পেন্‌সিল দিয়া কয়েক ছত্র লিখিয়া সেখানি লালচাঁদের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল: “আফিসে এখানা নিয়ে যাও; তোমাকে একশো টাকা দেবার কথা এতে লিখে দিয়েছি। এই টাকায় ওখানকার ব্যবস্থাগুলো সেরে ফেলবে।”

অতি উল্লাসে পুনরায় কুর্নিশ করিয়া লালচাঁদ পিছু হটিয়া কক্ষের বাহিরে আসিল।

একটু পরেই হোটেল-সংলগ্ন বাগানে আশা দেবীর সহিত নন্দলালের সাক্ষাৎ হইল।

নন্দলাল কহিল: “তা'হলে আপনি তৈরী থাক্‌বেন, কাল ভোরেই আমরা বেরুবো।”

সোল্লাসে আশাদেবী কহিয়া উঠিল: “বলেন কি, হোটেলে বসে-বসেই আপনি এরই মধ্যে সব ঠিক ক'রে ফেলেছেন? জঙ্গলটা কোথায় শুনি?”

নন্দলাল কহিল: “কাছেই, কিন্তু শোনার আগে দেখাই ভাল। তবে একটা কথা, যদি ফিরতে দেরী হয়—বাবার কাছ থেকে অনুমতিটা,—কি জানি যদি রাগ করেন।”

আশা দৃঢ়স্বরে কহিল: “এ সব ব্যাপারে বাবা আমাকে ছেলের মতই শক্ত মনে করেন। তিনি জানেন, মেয়ে হ'লেও কাচের পিয়ালার মত আমি ঠুনকো নই—”

হাসিয়া নন্দলাল কহিল : "লোহার ঘড়ার মত মজবুত, কি বলেন ?"

আশা মুখখানা কিছু কঠিন করিয়াই উত্তর দিল : "মজবুত না হ'লে আপনার সঙ্গে এমন ক'রে কখনই মিশতে সাহস ক'র্‌তুম না—এটা মনে রাখ্‌বেন।"

কাশী-নরেশের রাজধানী রামনগরের সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত রাজপথের বক্ষ বাহিয়া যখন মোটর ছুটিতেছিল, তখন প্রভাত হইয়াছে। চারিদিকেই একটা শান্ত-গম্ভীর সৌন্দর্য যেন ঝলমল করিতেছে। বড় বড় তোরণ ও আড়ম্বরপূর্ণ সজ্জায় মণ্ডিত হইয়া নগরী যেন কোন মহোৎসবের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

নন্দলাল সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া সোফারকে প্রশ্ন করিল : "রাস্তায় এ সব সাজ-সজ্জা কেন ?

লালা লালচাঁদ জানাইল : "রামলীলার আজ একটা বড় খেলা হবে, ভারি ঘটা হয়, হুজুর ! তাই তামাম সহর সাজানো হয়েছে।"

নন্দলাল প্রশ্ন করিল : "কারা লীলা দেখায় ?"

লালচাঁদ কহিল : "লীলা দেখাবার রীতিমত দল আছে যে হুজুর ! এতে হাজার-হাজার রূপিয়া খরচা হয়। এক এক রাতে এক একটা লীলা হয়। রামনগর থেকে সুরু ক'রে সারা বনারস সহর যুড়ে এই লীলা চলে। আজ রাতে 'নাক কাটাইয়া খেলা হবে হুজুর !"

আশা দেবী কহিল : "ভালই হয়েছে, ফের্‌বার সময় আমরা 'নাক কাটাইয়া খেল' দেখে যাবো।"

লাল চাঁদ নীরবেই কথাটা শুনিল। কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

দেখিতে দেখিতে সহরের সীমানা পার হইয়া মোটর গ্রামের পথে

পড়িল। দুই ধারে সবুজ প্রান্তর—ধান, যব ও অন্যান্য শস্যের গাছগুলি বায়ুহিল্লোলে দুলিয়া দুলিয়া প্রকৃতির অপূর্ব সৌন্দর্যচ্ছটা বিকাশ করিতেছে।

আশা দেবী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কহিয়া উঠিল: "চমৎকার! পাঞ্জাবের ক্ষেতগুলিও ঠিক এমনই সুন্দর!"

পল্লীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া মোটর যখন জঙ্গলের পথে পড়িল, তখন দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। কঙ্করাচ্ছন্ন বন্ধুর পথে মোটরখানা নাচিতে নাচিতে তির্য্যক্‌গতিতে চলিতেছিল। ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রচুর সঞ্চার সত্ত্বেও অভিনব দৃশ্য দর্শনের আনন্দে আরোহীদ্বয় তন্ময়।

মোটরের গতি ক্রমশঃ শিথিল হইয়া আসিলে মোটর হইতেই আরোহী-যুগল লক্ষ্য করিল, অভ্রভেদী শালগাছের সারি অতঃপর প্রাচীরের মত দুর্ভেদ্য হইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং গাছগুলির গায়ে গা মিশাইয়া দুইটি অতিকায় হাতী তাহাদের ভূচুম্বিত শুঁড়গুলি দুলাইতেছে। নিমেষেই আশা দেবীর দুই চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল।

নন্দলাল তাহা লক্ষ্য করিয়া সহাস্যে প্রশ্ন করিল: "অবাক হয়ে কি দেখ্‌ছেন?"

আশা দেবী উত্তর দিল: জঙ্গলের কথা মনে হ'লে যে'কটা জীবের নাম আপনিই মনে ওঠে, তাদেরই দু'টি দেখ্‌ছি আমাদের অভ্যর্থনা ক'রতে দাঁড়িয়ে আছে। শুধু হাতী কেন, তাঁবুও নজরে পড়েছে, মশাই! সত্যই আপনি অদ্ভুত লোক; এত দূরে কত আয়োজনই আপনি ক'রে রেখেছেন! আপনি সব পারেন!"

মোটরের গতি থামিতেই দেখা গেল, হাতী দুইটা যেখানে দাঁড়াইয়া আছে, তাহার সান্নিধ্যেই ছোট একটি তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর মুখে বন্দুক-ধারী এক সিপাহী, তাহার মাথায় প্রকাণ্ড এক পাগড়ী, গলায় ঝোলানো একটা চর্ম্মাধারে মালার আকারে সারিবদ্ধ কতকগুলি টোটা; লোকটার

মুখের গোঁফ-দাড়ি পাগড়িটীর মতই জমকালো। মোটর থামিতেই আরোহীদের উদ্দেশে সে মিলিটারী কায়দায় সেলাম দিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল। আশে-পাশে আরও কয়েকজন লোক ছিল, তাহারা সকলেই আভূমি নত হইয়া মোটরের আরোহীদ্বয়কে অভিবাদন করিল।

গাড়ীর দরজা খুলিয়া দিয়া লালা লালচাঁদ সবিনয়ে কহিল: "এই-খানেই নামতে হবে, হুজুর! গাড়ী আর যাবে না; হুজুরের ফরমাসমত সবই এখানে মজুত আছে।"

আশা মৃদু হাসিয়া কহিল: "শেষের ব্যবস্থাও বাদ দেননি দেখছি, মায় খাটিয়া পর্য্যন্ত!"

তাঁবুর ভিতরে সাদা চাদর-বিছানো দুইখানি খাটিয়া ও তাহার মাঝখানে বেতের একটি টেবলাকৃতি আধারে আহার্য্যের ব্যবস্থা ছিল। এক-নজরে তাহা দেখিয়া লইয়া নন্দলাল সহাস্যে প্রশ্ন করিল: "খাটিয়ার ওপর এ-রকম কটাক্ষ করার অর্থটা ত বুঝতে পারলুম না!"

আশা মুখে দুষ্টুমীর হাসি আনিয়া উত্তর দিল: "আপনার সোফারটি এমনই তৎপর যে, যদি জঙ্গলে আমাদের শেষ নিশ্বাসই পড়ে, সেই ভেবে শেষের কাজ ক'রতে খাটিয়া পর্য্যন্ত সাজিয়ে রেখেছে।"

নন্দলাল হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল: "উপস্থিত এ দুটো আমাদের ডিনারের ব্যাপারে সাহায্য ক'রবে। আসুন, যে সব যোগাড় হয়েছে, তার সদ্ব্যবহার করি; সময়ের অপব্যবহার এখন ঠিক নয়।"

তাঁবুর ভিতরে মধ্যাহ্নভোজনের প্রচুর আয়োজন ছিল। অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই আহারপর্ব শেষ করিয়া উভয়ে অভিযানপর্বারম্ভের তাগিদ দিল। স্থির হইল, লালচাঁদ মোটর লইয়া এইখানেই প্রতীক্ষা করিবে; গাইড ঘণ্টা-তিনেকের মধ্যেই হুজুর-হুজুরাইনকে জঙ্গল ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আনিবে। বন্দুকধারী সিপাহী হুজুরের হাতীতে থাকিয়া গাইডের কাজ করিবে। উঁচু রেলিং দেওয়া সুরক্ষিত হাওদার হাতীতে হুজুরাইন থাকিবেন।

নিবিড় নিস্তব্ধ বনভূমির শান্তি ভঙ্গ করিয়া ও চারিদিকে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া তুলিয়া পাশাপাশি দুইটি হাতী ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইল। আশা হাতীর গতিভঙ্গিতে রীতিমত দোলা পাইয়া আনন্দের আবেগে কহিল: "আপনাকে শত ধন্যবাদ! এ একটা সত্যিকার য়্যাডভেঞ্চার—আমার পক্ষে সম্পূর্ণ নূতন!"

কৌতূহলোজ্জ্বল দৃষ্টিতে সহযাত্রিনীর দিকে চাহিয়া নন্দলাল কহিল: "আমার পক্ষেও আপনার এই আনন্দময়ী মূর্তিদর্শন এই প্রথম। বনদেবীর মতই আপনি যেন সারা বন আলো করে চলেছেন!"

আশার মুখখানা মুহূর্তে রাঙ্গা হইয়া উঠিল; মুখের ভাবটুকু গোপন করিয়া চোখের দৃষ্টিটা সহযাত্রীর দিকে তীক্ষ্ণভাবে নিবদ্ধ করিয়া সে উত্তর করিল: "দেবী কিন্তু গজে চলেছেন, ফলে ছত্রভঙ্গ না হয়।"

হঠাৎ সমবেত কণ্ঠের চীৎকার উঠিল: "বাঘ বেরিয়েছে—বাঘ—"

আশা সোজা হইয়া বসিয়া কহিল: "শুনছেন?"

নন্দলাল গাইডের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল: "ব্যাপার কি! কারা চেঁচায়?"

গাইড জানাইল: আমাদেরই লোক; জঙ্গলে ঢোকবার আগেই ওদের পাঠানো হয়—যদি বাঘের সন্ধান পায়।"

নন্দলাল সাগ্রহে কহিল: "সন্ধান তা'হলে পেয়েছে?"

গাইড জানাইল: তাই মালুম হচ্ছে। এখনই সব জান্‌তে পারা যাবে।"

আশা সোল্লাসে কহিল: "আমাদের য়্যাডভেঞ্চার তা'হলে সত্যই রোম্যাণ্টিক হবে। হাতীতে যখন ওঠা গেছে, বাঘ দেখা চাই-ই—"

গাইড অবাক্-বিস্ময়ে এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে চাহিল। বাঘের নাম শুনিয়া এই জঙ্গলে অনেক মেম-সাহেবেরও যে মূর্চ্ছা যাইবার যো হইয়াছিল, তাহা সে জানে। অথচ বাঙ্গালীর মেয়ে হাসিমুখে বলে কি না—বাঘ দেখা চাই-ই!"

পুনরায় চীৎকার উঠিল: "শের—শের—হুঁসিয়ার!"

স্বর শুনিয়া মনে হইল, তাহা অধিক দূরবর্ত্তী নহে, সন্নিহিত স্থান হইতেই নির্গত হইতেছে।

নন্দলাল উত্তেজিত ভাবে গাইডের দিকে চাহিয়া কহিল: "তোমার বন্দুকটা আমাকে দাও।"

গাইড মাথা-নাড়া দিয়া কহিল: "সঙ্গে আওরৎ, নিশানার একটু এদিক-ওদিক হ'লে সর্ব্বনাশ হবে। এ জঙ্গলের শের ভারি সয়তান আছে।"

নন্দলাল কহিল: "নিশানা আমার খুব দুরস্ত আছে; আর আওরতের জন্য ভাবনা তোমার চেয়ে আমার বেশী।"

গাইড মুখখানা ভার করিয়া কহিল: "বেশ ত, বাঘ আসুক, তখন হুজুরের হাতেই না হয় বন্দুক দেব।"

আশাকে এই সময় হাওদার উপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া ঝুঁকিতে দেখিয়া নন্দলাল তাড়াতাড়ি ব্যগ্রকণ্ঠে কহিল: "করছেন কি, ঝুঁকবেন না অমন ক'রে, হাতী একটু বেচাল হ'লেই হুমড়ী খেয়ে পড়ে যাবেন।"

নন্দলালের কথার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভাবে আবার চীৎকার উঠিল: "শের, শের,—ফায়ার কর—ফায়ার!"

এবার দেখা গেল, গাছের উপর হইতে সমবেত কণ্ঠে কতিপয় ব্যক্তি এই নির্দেশ দিতেছে। ইহাদের চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা সুবৃহৎ ঝোপ যেন আলোড়িত হইয়া উঠিল, অমনই গাইডের হাতের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল—গুড়ুম্—গুম্!

আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মাহুতের হাতের অঙ্কুশ পড়িল হাতীর মাথায় এবং তৎক্ষণাৎ যে হাতীর পীঠে গাইড ও নন্দলাল ছিল, সেটা মদমত্ত গতিতে ছুটিল পুরোভাগে আরও নিবিড় জঙ্গল ভেদ করিয়া এবং অপর হাতীটা অস্বাভাবিক বেগে ঠিক ইহার বিপরীত দিকে ফিরিয়া প্রাণপণে ছুট দিল।

এই হাতীটার মাথায় মাহুত ও হাওদায় আশা ব্যতীত তৃতীয় প্রাণী কেহ ছিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে আশা মাহুতকে প্রশ্ন করিল: "আমাদের হাতীটা যে ফিরে চল্‌লো! তুমিও ত দেখ্‌ছি দিব্যি ওকে ছোটাচ্ছ! ফেরাও শীগ্‌গীর—"

মাহুত কহিল: "আমি ছুটিয়েছি, না হাতী বাঘের সাড়া পেয়ে খাপ্পা হয়ে ছুটেছে! আপনি সাম্‌লে বসুন, হাতীকে আমি কিছুতেই বাগাতে পারছি না—"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাতীর মাথায় ঘন ঘন অঙ্কুশের আঘাত দিল; কিন্তু হাতী ফিরিল না, তাহার গতি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও দ্রুত ও দুর্বার হইয়া উঠিল।

আশা হাওদায় দেহভার ন্যস্ত করিয়া পিছনের দিকে চাহিয়া দেখিল, অপর হাতীটা ইতিমধ্যেই তাহার আরোহীদিগকে লইয়া বনের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বনের সেই নিবিড় অংশটা তখনও আলোড়িত হইতেছিল, কিন্তু হাতীটার কোন চিহ্নই তাহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইল না, কেবল উপর্য্যুপরি কয়েকবার বন্দুকের গুরুগম্ভীর আওয়াজ তাহার কর্ণপটাহে ভীষণভাবে প্রতিধ্বনিত হইল।

আশার মনে সহসা একটা সন্দেহ জাগিল। অপরিচিতের মনস্তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতে চির-অভ্যস্ত এই মেধাবতী মেয়েটার দুই চক্ষু সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল ;—এই অপ্রিয়দর্শন মাহুতটার মুখের রেখায় ও চোখের পরদায় অপরাধীর উপযুক্ত কোন লক্ষণ সে বুঝি সুস্পষ্টরূপে লক্ষ্য করিল! পরমুহূর্ত্তেই সে হাওদায় ভর দিয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া মাহুতের পিরাণের কলারে সজোরে টান দিয়া কহিল : "ফেরা বল্‌ছি হাতীকে, নইলে এখনি ঠেলে ফেলে দেব নীচে।"

হাতের অঙ্কুশটি হাতীর মাথায় চাপিয়া ধরিয়া মাহুত টাল্‌টা সাম্‌লাইয়া লইল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার কণ্ঠ দিয়া এমন একটা তীক্ষ্ণ কর্কশ স্বর নির্গত হইল যে, তাহা শুনিবামাত্রই ধাবমান হাতীটা তৎক্ষণাৎ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া গেল। আশাও চমৎকৃত! কিন্তু তথাপি সে মাহুতের জামার কলার ছাড়িল না, বা কিছুমাত্র বিচলিত হইল না ; পূর্ব্ববৎ দৃঢ়স্বরেই পুনরায় আদেশের ভঙ্গিতে কহিল : "ফেরাও শীগ্‌গীর—"

মাহুত কোন প্রতিবাদ করিল না, এমন কি জামার কলারটি ছাড়াইয়া লইবারও কিছুমাত্র প্রয়াস পাইল না ; সে পুনরায় সুর করিয়া আর একটা তীক্ষ্ণ স্বর তাহার কণ্ঠ দিয়া বাহির করিল এবং তাহা শুনিবামাত্রই হাতীটা হঠাৎ এমন ভাবে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িল যে, আশা টাল্ সাম্‌লাইতে না পারিয়া মাহুতের পীঠের উপর হুম্‌ড়ি খাইয়া পড়িবার মত হইল।

ঠিক এই সময় পিছন হইতে দুইটি সবল বাহুর আকর্ষণে আসন্ন পতন হইতে নিষ্কৃতি পাইলেও স্পর্শের প্রভাবে অতি বিস্ময়ে শিহরিয়া বিদ্যুদ্বেগে পিছনে মুখ ফিরাইতেই যাহা সে দেখিল, তাহার মত সম্ভ্রান্তশীলা তরুণীর পক্ষে সে দৃশ্য কিছুতেই সহনশীল নহে! দিব্য হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠদেহ গৌরবর্ণ এক পশ্চিমা পুরুষ হাতীর হাওদার উপর বসিয়া পিছন হইতে তাহার দুইটি বাহুমূল দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া হিন্দুস্থানী ভাষায় তখন কহিতেছিল: "ডরো মৎ, বাহাদুর আ গিয়া!"

এক ঝটকায় নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া আশা একেবারে সোজা হইয়া হাওদার রেলিংএ ভর দিয়া লোকটার পানে অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে চাহিল।

কোমলাঙ্গী এক নারীর এরূপ তৎপরতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া লোকটা প্রথমটা একটু থতমত খাইয়া গেল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাব সামলাইয়া লইয়া সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পুনরায় হাওদায় সংন্যস্ত আশার হাত দুইখানি পরিপূর্ণ শক্তিতে চাপিয়া ধরিল। হাতীটাও মাহুতের ইঙ্গিতে ঠিক এই সময় গা-ঝাড়া দিয়া উঠিয়া গোঁ-ভরে ছুট দিল।

আগন্তুক জোরে হাসিয়া কহিল: "আরে জী, দোনো দফায় তোমার জান আমি বাঁচিয়ে দিয়েছি—হাত দু'খানা ধ'রে, নইলে পড়তে এতক্ষণ হাতীর ঐ মাথাটা টপ্‌কে একবারে জমীনে।"

হাতী ছুটিতে আরম্ভ করিলেই লোকটা এবার নিজেই আশার হাত দুখানি ছাড়িয়া দিয়া পিছু হটিয়া হাওদার অপর প্রান্তের রেলিংয়ে ঠেস দিয়া বসিল এবং আশার ক্রোধারক্ত মুখের পানে চাহিয়া কহিল: "হাওদার পীঠে পীঠ দিয়ে ভাল করে জেঁকে ব'স, নইলে ফের টাল্ খাবে, আবার আমাকে ঐ দুখানা হাত চেপে ধ'রতে হবে।"

দুই হাতে রেলিংটা শক্ত করিয়া ধরিয়া আশা তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল: "তুমি কে? কার হুকুমে আমার হাতীর পীঠে উঠে বসেছ শুনি?"

লোকটা আবার তেমনই উচ্চ রোলে হাসিয়া উঠিল। হাসির রেশ থামিলে সে উত্তর দিল: "আমাকে শিকারী ব'লেই ধ'রে নিতে পার। বনের ভেতর, হাতীর পীঠে তোমার মতন খুবসুরৎ সুন্দরীকে দেখেই আমি শিকার ছেড়ে হাতীর পিছু নিই; তার পর হাতটা হঠাৎ থাম্‌তেই তুমি পড়ে যাচ্ছ দেখে, হাতীর পিছন দিয়ে হাওদার ওপর উঠে তোমাকে ধরি। কিন্তু তাজ্জব এই, তুমি খুসী হয়ে তারিফ না ক'রে, চোক পাকিয়ে কৈফিয়ৎ চাইছ—কেন আমি তোমার হাতীর পীঠে উঠেছি। বা—জী, বাঃ!"

লোকটার কথা বলিবার ধরণ শুনিয়া এবং তাহার মুখে ও চোখে তীব্র লালসার একটা কদর্য ছায়া দেখিয়া আশার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেলেও, সে মনের বিপুল উত্তেজনাকে সবলে দমন করিয়া স্থিরভাবেই হাওদার রেলিংটা ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। যে দৃষ্টি সে মাহুতের মুখের উপর নিক্ষেপ করিয়া সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, সেই মর্মভেদী সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি তাহার মানসপটে যে স্মৃতিরেখা দাগিয়া দিল, তাহাতে সে দৃঢ়ভাবেই সাব্যস্ত করিয়া ফেলিল যে, এ মুখ ত অপরিচিত নহে, এই লোককে সে দেখিয়াছে! কিন্তু কবে? কোথায়? কি সূত্রে?

আগন্তুকের মনে হইল, মেয়েটি বোধ হয় ভয় পাইয়াছে। একটা কদর্য হাসিতে মুখখানা ভরাইয়া সে কহিল: "আমি ত পিছিয়ে বসেছি, বস্‌বার জায়গা ত অনেকটা রয়েছে; ব'সবে—না আবার হাত ধ'রে বসিয়ে দিতে হবে?"

হঠাৎ আশার মুখে হাসির একটু ক্ষীণ রেখা ফুটিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে চোখের সহিতও বুঝি তাহার সংযোগ ঘটিল; সেই অপূর্ব দৃষ্টিতে চাহিয়া ও কণ্ঠস্বর সুমধুর করিয়া সে কহিল,—"আপনি অনেক কষ্ট

ক'রেছেন, তাতেই আমি লজ্জায় কাঠ হয়ে গেছি, আর আপনাকে কষ্ট ক'রতে দেব না। হাওদা ধ'রে দাঁড়িয়ে আমি ভারি আরাম পাচ্ছি।"

মেয়েটির কথা শুনিয়া ও মুখ-চোখের অপ্রত্যাশিত ভঙ্গী দেখিয়া লোকটা যেমন মুগ্ধ হইল, তেমনই লজ্জাও পাইল। সে বরাবর যাহাকে তাচ্ছিল্য করিয়া 'তুমি, বলিয়া সম্ভাষণ করিয়াছে, সেই তাহাকে 'আপনি' বলিয়া অপ্রতিভ করিয়া দিল।—যদিও ইহাদের কথোপকথন হিন্দীতে চলিয়াছিল, কিন্তু আমরা বাঙ্গালাতেই তাহা প্রকাশ করিলাম।

নিজের ত্রুটিটুকু সংশোধন করিতে এবার সে আশার দিকে চটুল দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিল,—"এখানে বসলে আপনি আরও বেশী আরাম পাবেন, আর আমিও তাতে খুব খুসী হব।"

মৃদু হাসিয়া পূর্ব্ববৎ মধুর স্বরে আশা কহিল,—"আমি তা বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু এটুকু জায়গার মধ্যে আমাদের দু'জনের বসাটা কি ঠিক?"

—"ঠিক নয় কেন? বন্ধুলোকের সঙ্গে বসতে কি দোষ? আমি যখন আপনাকে দু-দু'বার বাঁচিয়েছি, তখন আমাকে বন্ধু বলে মানবেন না?"

—"বন্ধু ব'লে আপনাকে মানলেও, চলন্ত হাতীর পিঠে পাশাপাশি ব'সে যেতে হবে, তার কোনো কথা আছে?"

—"মোটর গাড়ীতে আর-এক-জন বন্ধুর পাশে ব'সে দু'বেলা কেমন ক'রে হাওয়া খেতে যেতেন?"

আশা দেবীর দুই চক্ষু সহসা বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। অস্পষ্ট স্মৃতিরেখা এতক্ষণে চক্ষুর উপর যেন জীবন্ত আলেখ্য তুলিয়া ধরিল। দুটি বেলা হোটেল হইতে মোটরে বাহির হইবার সময় চৌকাঘাটের পথে উদ্যান-ভবনের সম্মুখে পাথরের বেদীর উপর যে যে লোকগুলা ক্ষুধিত দৃষ্টিতে তাহার পানে তাকাইয়া থাকিত, এই লোকটাই তাহাদের

অন্যতম; ইহাকে ঐ সময় সে প্রত্যহই দেখিয়াছে; এই মুখ, এই চোখ, এই কদর্য্য দৃষ্টি কয়দিন পর্য্যায়ক্রমে দেখিয়া মনে মনে সে কৌতুক অনুভবই করিয়াছে, কিন্তু আজ সেই লোকই জনহীন দুর্গম অরণ্যে কৌশলজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে আয়ত্তাধীন করিতে উদ্যত!

আশার এই অনুমান কঠোর সত্য হইয়াই দাঁড়াইল। মানুষকে দেখিলেই মনে মনে তাহার সম্বন্ধে একটা কিছু ধারণা করিয়া লইয়া, সেই ধারণা সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণার পর একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আশার একটা মস্ত খেয়াল ছিল। এই খেয়ালের বশেই সে এক দিন চৌকাঘাটের উক্ত বাগান-বাড়ীটা অতিক্রম করিবার সময় পার্শ্বোপবিষ্ট নন্দলালকে সকৌতুকে বলিয়াছিল,—'ঐ লোকগুলোকে দেখছেন! ওদের চোখ আর মুখ দেখে কি মনে হয় বলুন তো?' নন্দলাল হাসিয়া উত্তর দিয়াছিল,—'ওদের চোখগুলো আপনার রূপের আলোকে ঝল্‌সে গেছে, মুখগুলোও হয়েছে একদম মূক!' আশা হাসিয়া বলিয়াছিল,—'আপনার অনুমান ভুল! আমার কি ধারণা শুনবেন? যদি ওঁদের ক্ষমতা থাক্‌তো, আমাকে এখান থেকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধির শিলে পেষাই ক'রে গুলে খেয়ে ফেল্‌তো; আর আপনাকেও কেটে কুত্তা দিয়ে খাওয়াতো!' নন্দলাল হো হো শব্দে হাসিয়া মন্তব্য করিয়াছিল,—'কিন্তু ওদের দুর্ভাগ্যক্রমে এটা ওয়াজিরস্থান নয় যে, দিনে ডাকাতি করবে—অতএব মাভৈঃ!'

কিন্তু সেদিন আশা কৌতুকচ্ছলে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিল, তাই কি আজ এমন কঠোর সত্য হইয়া দাঁড়াইতে চলিয়াছে?

চিত্তের এই চাঞ্চল্য ও চিন্তার প্রবাহ ফল্গুর মত বুকের ভিতর প্রচ্ছন্ন রাখিয়া আশা দিব্য সপ্রতিভ ভাবে স্বাভাবিক সহজ সুরেই

হনুমানপ্রসাদের প্রশ্নটার এই বলিয়া জবাব দিল,- "ভাব-সাব হ'য়ে গেলে পাশাপাশি বসার কথা কি বলছেন, একপাতে খেতেও তখন বাধে না।"

কথাটা শুনিয়া হনুমানপ্রসাদ ভারি খুসী হইল। মনে মনে তখনই সে তস্‌জমা করিয়া লইল যে, এই আওরৎকে বাগে আনিতে তাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। প্রকাশ্যে কহিল,- "আমার যদি কসুর কিছু হয়ে থাকে, মাপ চাইছি; আর আর্জ্জী জানাচ্ছি—মেহেরবানি ক'রে আমার সঙ্গেও ভাব করুন।"

মুখখানা এবার একটু গম্ভীর করিয়া আশা কহিল,—"ভাব ক'র্‌তে হ'লে ভাবের ঘরে লুকোচুরি চলে না, দিল খুলে সব কথা বলতে হয়।"

মনে মনে কি ভাবিয়া হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"কিন্তু কথাগুলো যদি আপনার মনে না লাগে?"

মুখখানি উঁচু করিয়া আশা কহিল,—"আপনাকে যদি মনে লাগে, কথা লাগবে না কেন?"

হনুমানপ্রসাদ পুলকিত হইয়া কহিল,—"ধরুন, সে কথাটা যদি নোংরা হয়,—আর গলতি কিছু হয়ে থাকে?"

আশা স্নিগ্ধস্বরে উত্তর দিল,—"হ'লেই বা, তাতে কি হ'য়েছে? আপনি কি জানেন না—মেয়েরা ডাকাতকে পেয়ার করে—যদি সে খাঁটি কথা বলে, কিছু চেপে না রাখে; অর্থাৎ—মন খুলে মনের কথা জানায়।"

হনুমানপ্রসাদ এবার উৎফুল্লভাবে কহিল,—"ব্যাস্‌, তা'হলে আমি দিল থেকে পরদা সরিয়ে দিলুম। আপনার যা খুসী হয় জিজ্ঞাসা করুন, রামজীর কসম্—আমি বিল্‌কুল সাঁচ বলবো।"

অতঃপর আশাদেবীর প্রাসঙ্গিক প্রশ্নগুলির উত্তরে হনুমানপ্রসাদ অকপটে প্রকাশ করিল যে, আশা দেবীকে প্রথম দিন মোটরে দেখিয়াই

সে একেবারে পাগল হইয়া যায়। সে হাকিমের মেয়ে এবং তাহার সঙ্গী পুরুষটি একজন 'রইস' লোক জানিয়াও সে হাল ছাড়িয়া দেয় নাই, তাহার পিছনে গোয়েন্দা লাগায়। মোটর, সোফার, হাতী, মাহুত, সিপাই, সবাই তাহার হাতের লোক। বনে বাঘ বাহির হয় নাই, হাতীও বিগড়ায় নাই। মাহুতরা তাহার নির্দ্দেশমত কাজ করে। পুরুষ সঙ্গীটার উপর তাহার গোড়া হইতেই আক্রোশ; তাই তাহাকে বনের ভিতর প্রায় পাঁচ ক্রোশ তফাতে লইয়া গিয়া আটক রাখিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আর বাহিরের কোন মেয়েকে একবার এই জঙ্গলে আনিতে পারিলে তাহার মত বলিষ্ঠ পুরুষের পক্ষে তাহাকে বাধ্য করা কিছুমাত্র কঠিন নহে। এমন দুষ্কর্ম্ম সে অবাধেই অনেক বার করিয়াছে এবং এ পর্য্যন্ত তাহার উপর কোন দাগই পড়ে নাই। সে বেশ ভাল করিয়াই জানিয়াছে যে, রইস-ঘরের মেয়ে পাকে-চক্রে পড়িয়া ইজ্জত হারাইলেও কেলেঙ্কারীর ভয়ে কলঙ্কের কথা প্রকাশ করে না। তাহা ছাড়া, এই জঙ্গল বৃটিশ-সরকারের এলাকায়ও নয়, আর এমন কায়দা করিয়া এ সব অনাচার চালানো হয় যে, না চাপিয়া উপায় কি!

এই পর্য্যন্ত শুনিবার পর কণ্ঠে যেন জোর করিয়াই সহজ সুর আনিবার চেষ্টা করিয়া আশা প্রশ্ন করিল,—"তা'হলে আমার সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা হয়েছে, সেইটুকুই এবার শুনিয়ে দিন।"

হনুমানপ্রসাদ ঈষৎ হাসিয়া ও লুব্ধ-দৃষ্টিতে আশার দিকে চাহিয়া উত্তর দিল,—"এখনো বুঝতে পারেন নি? আস্‌বার সময় জঙ্গলের মুখে যে তাঁবুতে ব'সে আপনার সেই সাথীটির সাথে খানাপিনা করেছিলেন, আমরা সেইখানেই চলেছি। খাবার সেখানে তৈরী—পুরী, তরকারী, দহি, মিঠাই, মায় সরাব পর্য্যন্ত—বুঝেছেন?"

আশা অপাঙ্গ-ভঙ্গীতে তাহার মুখের ভাবটুকু লক্ষ্য করিয়া তৎক্ষণাৎ

উত্তর দিল,—"খুব বুঝেছি। কিন্তু আমাকে আপনি কি রকম বুঝেছেন বলুন ত?"

হনুমানপ্রসাদ সহাস্যে উত্তর দিল,—"জলের মত। আমার যা কিছু কসুর আপনি মাপ করেছেন, আপনার সেই বদমাস সাথাটাকে তফাৎ করায় খুসী হয়েছেন, আর এবার আমার সঙ্গে ভাব ক'রতে আলবৎ কাছে ঘেঁসে বসছেন"—এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সহসা ঝুঁকিয়া হাওদাসংলগ্ন আশার বাম হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া সম্মুখের দিকে একটা টান দিল।

অপর হাতে হাওদার রেলিংটার উপর জোর দিয়া আশা ধৃত হাতখানি এমন কৌশলে ঘুরাইয়া লইল যে, তাহা তৎক্ষণাৎ হনুমানপ্রসাদের মুষ্টিমুক্ত হইয়া আসিল। শিষ্টাচার ভুলিয়া হনুমানপ্রসাদ পরক্ষণে মুখে বিস্ময়-কৌতুকের ভঙ্গী প্রকাশ করিয়া কহিয়া উঠিল,—"বা—জী! তুমি ত ভারি খেলোয়াড় আওরৎ দেখ্‌ছি—"

কিন্তু পুনরায় তাহাকে বলপ্রকাশের সুযোগ না দিয়া মুখে মিষ্ট হাসি ফুটাইয়া আবদারের সুরে মৃদু স্বরে আশা কহিল—"লোকের সাম্‌নে—দিল্‌লাগি করতে নেই, দেখতে পাচ্ছো না—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার দুই চক্ষুর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত হাতীর মাথায় উপবিষ্ট মাহুতটাকে নির্দ্দেশ করিয়া দিল।

হনুমানপ্রসাদ কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু আশা তাহাতে বাধা দিয়া উল্লাসের সুরে কহিল,—"ঐ ত তাঁবু দেখা যাচ্ছে, আমরা এসে পড়েছি।"

চিত্তের সমস্ত ক্ষুধা দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে ধরিয়া হনুমানপ্রসাদ আশার হাস্যোজ্জ্বল মুখখানির দিকে চাহিল এবং সজোরে একটা শীষ দিয়া কহিল,—"তুমি ভারি চালাক আছ আমি বুঝেছি, আচ্ছা তাঁবুতে চলত—"

হাতীর গতিও এবার শিথিল হইয়া আসিল, আশা এবার সতর্ক হইয়াই রহিল—যাহাতে টাল খাইয়া পুনরায় পতনোন্মুখ হইতে না হয়।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝিয়া আশা সহজভাবেই হনুমানপ্রসাদের পিছু পিছু তাঁবুর ভিতরে প্রবেশ করিল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে এইখানেই নন্দলালের সহিত মধ্যাহ্ন-ভোজন পরম তৃপ্তির সহিত সে শেষ করিয়াছিল। এবার দেখিল, ভোজের প্রচুর আয়োজন বেতের টেবিলখানিকে ভরাইয়া দিয়াছে। অন্যান্য আহার্য্যের সহিত বৃহদায়তনের একটি বোতলও ভোজের টেবিলের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। হনুমানপ্রসাদ হাতীর পীঠে বসিয়াই ইহার আভাস দিয়াছিল এবং এখানে গায়ের জমকালো লেবেলটিও সগৌরবে বস্তুটির পরিচয় ব্যক্ত করিতেছিল।

তাঁবুটির সর্ব্বত্র দৃষ্টি সঞ্চার করিয়া আশা আরও কতিপয় নূতন সামগ্রীর সন্ধান পাইল। টেবলের প্রায় সম্মুখে হনুমানপ্রসাদ যে খাটিয়াখানায় বসিয়াছে, তাহার ঠিক পিছনেই তাঁবুর গায়ে সংলগ্ন পিতলের হুকে একটা বন্দুক ঝুলিতেছে। তাহার পাশে খাপে-আঁটা একখানা তলোয়ার, অপর পার্শ্বে একটা লম্বা বর্শা।

গায়ের রেশমী চাদরখানা খুলিয়া খাটিয়ার উপর রাখিয়াই হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"আসুন, এবার ভোজনটা সেরে নেওয়া যাক্।"

টেবলের উপর পার্শ্বের খাটিয়াখানায় আশা দেবী এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া তাঁবুটার ভিতরের অবস্থা দেখিতেছিল। আহ্বান শুনিয়াই সে তাড়াতাড়ি কহিল,—"আমার ভাগটা টেবিলেই থাক্, আপনি ও পাটটা আগে সেরে নিন্।"

মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন প্রকাশ করিয়া হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"বাঃ! তা কি কখন হ'তে পারে? তুমিই ত তখন ব'ল্লে—ভাব হয়ে গেলে এক পাতে বসে খাওয়া পর্য্যন্ত চলে! তবে?"

একটা উদ্গার তুলিয়া ও মুখখানা একটু বিকৃত করিয়া আশা দেবী উত্তর দিল,—"কথাটা ঠিকই বলেছিলুম, কিন্তু কি করি বলুন ; ঘণ্টা-কতক আগে যা খেয়েছি, তাই হজম হয় নি। হাতীর পীঠে দোলন খেয়ে গাটা খালি খালি গুলিয়ে উঠছে, অভ্যাস নেই ত এ সব! আপনি খান, আমি বরং পরিবেষণ করি—"

কথার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা উদ্গার তুলিয়া ও মুখখানা পুনরায় বিকৃত করিয়া সে বুকের ভিতরের কষ্টটা জানাইতে প্রয়াস পাইল।

হনুমানপ্রসাদ বক্রকটাক্ষে তাহার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "ও রোগের ভাল দাওয়াই আছে ঐ বোতলটায়, মুখটা খোলাই আছে, ঢুক করে একটু—"

তাড়াতাড়ি কথাটায় বাধা দিয়া আশা কহিল,—"হবে'খন, খেয়ে উঠে আপনিই ঢেলে দেবেন, আমিও অমনি ঢুক করে গিলে ফেলবো, প্রথম হাতেখড়ি কি না—দেখিয়ে দিতে হয়।"

এমন মনমাতানো সুরে ও অভিনেত্রীসুলভ ভঙ্গীতে আশা এই কথাগুলি কহিল যে, তাহার প্রত্যেকটি রূপমুগ্ধ হনুমানপ্রসাদের কাণের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ করিয়া রীতিমত মোচড় দিতে লাগিল। সহপানের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে এমনই চঞ্চল ও তৎপর করিয়া তুলিল যে, মিনিট দশেকের মধ্যেই তাহার ভাগের প্রায় দিস্তাখানেক পুরী, খানিকটা ভিণ্ডীর ঘঁাট, গণ্ডা দুই দহি-বড়া ও গুটিদশেক মুগের লাড়ু গো-গ্রাসে নিঃশেষ করিয়া কহিল,—"পানি ত এবার চাই।"

আশা দেবী বোধ হয় ইহারই প্রত্যাশা করিতেছিল, মুখের হাসিটুকু আরও তীক্ষ্ণ করিয়া ও চোখের ইসারায় এই পাষণ্ড প্রার্থীটার মাথাটা ঘুরাইয়া দিয়া মর্ম্মস্পর্শী স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ পানি?"

রসিকতার সুরে হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"যে পানির দৌলতে সরম-লাজ বিলকুল টুটে যায়!"

এই বলিয়া সে বিশাল বোতলটির দিকে হাতের একটি অঙ্গুলি হেলাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার অভিবাঞ্ছিতা সঙ্গিনীটির দিকে অমার্জ্জিত দৃষ্টিতে চাহিয়া পুনরায় কহিল,—'কথা এবার রাখা চাই, পিয়ারী! প্রথম পেগ তুমি দেবে ঢেলে, পরের পেগ দেব আমি—"

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া আশা কহিল,—"এত রসিকতাও জানো তুমি! বেশ, তোমার কথাটাই রাখ ছি—"

ক্ষিপ্রগতিতে উঠিয়া সে বোতলটি হাতে লইল, পাশেই কাচের গ্লাসটি উপুড় করা ছিল; তাহা সোজা করিয়া বোতলের পানীয়ে পূর্ণ করিতে সে মনোনিবেশ করিল।

উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে হনুমানপ্রসাদ কহিল,—"ইয়া! এবার তোমাকে তোফা মানিয়েছে।"

পূর্ণপাত্রটি আগাইয়া দিয়া আশা কহিল,—"এই নাও।"

"সর্ব্বনাশ! করেছ কি? পূরো গ্লাস দিয়েছ? জান এর তেজ কত! এক আউন্সের বেশী খেলে—"

"তুমি হচ্ছ পুরুষসিংহ, পুরো বোতলটা শেষ করলেও তোমার কিছু হবে না। আমার সেই বন্ধুটি খাবার পর জলের বদলে এই জিনিষ একটি গ্লাস খেতো—জল না মিশিয়ে। তোমার উচিত অন্তত ডবল গ্লাস শেষ করা।"

"হাঁ? এই কথা! আচ্ছা—দেখ—"

চক্ষুর নিমেষে পূর্ণ পাত্রটি নিঃশেষ করিয়া সঙ্গিনীর হাতে ফিরাইয়া দিয়া হনুমানপ্রসাদ প্রশ্ন করিল,—"আচ্ছা, আমি যদি ডবল গ্লাস শেষ করি, তুমি অন্ততঃ একটি গ্লাস খাবে বল?"

মৃদু হাসিয়া গ্লাসটি পূর্ণ করিতে করিতে আশা দেবী উত্তর দিল,—"একটি গ্লাস কেন, বাকি বেতলটাই থাকবে আমার ভাগে, খুসী মনেই সেটার সদ্ব্যবহার করা যাবে।"

মনের উল্লাস এবার আর দমন করিতে না পারিয়া হনুমানপ্রসাদ তাহার পুরোবর্ত্তিনী সঙ্গিনীটির সুগৌর রক্তাভ চিবুকটির উদ্দেশে হাতখানা বাড়াইয়া দিল। কিন্তু অতিমাত্রায় সতর্ক থাকায় ঠিক এই সময় এমন ক্ষিপ্রভাবে সে গ্রীবাটি বাঁকাইয়া দিল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার হাতের পূর্ণ পাত্রটি হনুমানপ্রসাদের প্রমত্ত হাতখানার সম্মুখে ঢালের মত ধরিল যে গ্লাসটি হস্তচ্যুত হইয়া তাহার গায়ের উপর দিয়া খাটিয়ার বুকে গড়াইয়া পড়িল।

সুরাসিক্ত পিরানটা তৎক্ষণাৎ খুলিবার অভিপ্রায়ে হনুমানপ্রসাদ তাহার প্রান্তভাগ দুই হাতে ধরিয়া মাথার উপরিভাগে যেমন উঁচু করিয়া তুলিয়াছে,অমনই তাহার পুরোবর্ত্তিনী সঙ্গিনীটি অপর খাটিয়ার আস্তরণখানি দুই হাতে তুলিয়া বাঘিনীর মত ঝাঁপাইয়া পড়িল সেই অপ্রস্তুত নরপশুটির বিপুল দেহের উপরে। পিরাণে আবদ্ধ হনুমানপ্রসাদের দুই বাহু ও মুখখানার উপর হাতের মোটা সুতরঞ্চিখানা চাপা দিয়া সাহস, সতর্কতা, তৎপরতা ও জিউজিৎসুর অপূর্ব্ব প্যাঁচে দুই মিনিটের মধ্যেই এমন ভাবে আশা তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া ফেলিল যে, নিজের শক্তিপ্রকাশ বা চীৎকার করিবার কোন সুযোগই সে পাইল না। দেহে ও মনে প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়া এবং সকল সঙ্কোচ কাটাইয়া এই মেয়েটি বরাবর সকল বিষয়ে পুরুষের সহিত পাল্লা দিবার যে সাধনায় ব্রতী হইয়াছিল, আজ মহাসঙ্কটের সময় তাহা সার্থক হইল ভাবিয়া সে বুঝি মুহূর্ত্তের জন্ত স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল।

কিন্তু যে বিপুল উত্তেজনা ও উদ্বেগ এতক্ষণ সে বিপুল প্রয়াসে বক্ষমধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল, তাহারা এবার সুযোগ বুঝিয়া তাহাকে ক্ষণকালের

নন্দলাল সোৎসাহে হুঙ্কার দিল, "হুর্‌রে ! [illegible] [illegible]ই কিছু প্রত্যাশা করেছিলুম। সেই পাজীটা কোথায় ?"

"এই পাজীটার একখানা পা আগে খোঁড়া করি, পরে [illegible] কথা।" সঙ্গে সঙ্গে আশার হাতের বন্দুকের নলটি লালচাঁদের পায়ের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িল।

হাতের লাঠিটা মাটীতে ফেলিয়া দিয়া ও দুই হাত মাথার উপর তুলিয়া লালচাঁদ ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"মাফ্ করুন, মাজী, [illegible]মার কসুর মাফ করুন।"

আশা ক্রোধবিচলিত স্বরে বলিল,—"কসুর, না, বেইমানী, [illegible] বিশ্বাস-ঘাতক, বেইমান! তুমি জেনে-শুনে যে বদমাশি করেছ, [illegible] মার্জনা নেই, তোমাকে শাস্তি নিতে হবে, উল্লুক !"

লালচাঁদ আতঙ্কবিহ্বল চিত্তে কম্পিত পদে আশার সম্মুখে আসিয়া সসম্ভ্রমে কুর্ণিশ করিয়া দাঁড়াইল।

আশা তাহার মুখের উপর কঠোর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "লাঠি তোলার চেয়েও অপরাধ তোমার গুরুতর। তুমি যে হনুমান-প্রসাদের স্পাই, হোটেলের মেয়েদের ভুলিয়ে আনো, আমাকেও ফাঁদে ফেলবার চেষ্টা করেছিলে, তোমার মনিব নিজেই সে সব কবুল করেছে। এর শাস্তি কি জানো ?"

করযোড়ে সরোদনে লালচাঁদ কহিল—"আমার কসুর হয়েছে, মাজী মাফ চাইছি—"

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া 'মাজী' পুনরায় প্রশ্ন করিল,—"পথে আসতে আসতে তুমি বলেছিলে না—আজ তোমাদের 'নাক কাটাইয়া খেল্' হবে ?"

ঘাড় নাড়িয়া লালচাঁদ কহিল,—"জী!"

"সে খেল এখানেই সুরু হয়েছে। পয়লা খেল দেখিয়েছে [illegible]

নন্দলালের আহ্বানে তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে নিকটে আসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া উভয়ের উদ্দেশে প্রণাম করিল।

আশা কহিল,—"ভেতরে চল, তোমাদের মনিবের কাছে।"

চাদরখানা খুলিতেই দেখা গেল, হনুমানপ্রসাদের সমস্ত মুখখানা ফুলিয়া তোলো হাঁড়ির আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার সমুন্নত নাসিকাটির কোন নিশানাই নাই!

নন্দলাল প্রশংসমান দৃষ্টিতে আশার দিকে চাহিয়া গাঢ়স্বরে কহিল,—"বাঘের গহ্বরে ঢুকে বাঘকেই আপনি এমন ক'রে ঘায়েল করেছেন, আপনি সত্যই অদ্ভুত; আমি ভেবে পাচ্ছি না যে, আপনি কি! নারী, না দেবী?"

মরালের মত গ্রীবাটি উঁচু করিয়া দৃঢ়স্বরে আশা উত্তর করিল,—"বলতে পারেন—যুগের যাত্রী।"

এই সময় শয্যাশায়ী হনুমানপ্রসাদের কণ্ঠ দিয়া একটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বর ভাঙ্গা কাঁশীর বাজনার মত ধ্বনিত হইল,—"ও—ও—স-য়-তা-নী—"

কিন্তু সে ক্ষীণস্বরে আবৃত্ত নারীকণ্ঠের দৃপ্তস্বরের তখন প্রতিধ্বনি উঠিয়াছে: যুগের যাত্রী।

শেষ